Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আফরোজা বুলবুল কর্তৃক উপস্থাপিত **"'বেগম' পত্রিকায় প্রতিফলিত বাঙালি মুসলিম-নারীর সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষাচিন্তা (১৯৪৭-১৯৭০)"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

২৭.০৪.২০০৫

(ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রসঙ্গকথা	৩
অবতরণিকা	৪
প্রথম অধ্যায়	
'বেগম' পত্রিকা : সাধারণ পরিচয়	৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	
'বেগম' পত্রিকার সম্পাদকীয় : সমাজভাবনা	১৪
তৃতীয় অধ্যায়	
'বেগম' পত্রিকার সম্পাদকীয় : সংস্কৃতিচিন্তা	২৮
চতুর্থ অধ্যায়	
'বেগম' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ : সমাজ ও সংস্কৃতিচিন্তা	৪৯
পঞ্চম অধ্যায়	
'বেগম' পত্রিকায় প্রতিফলিত বাঙালি মুসলিম-নারীর ভাষাচিন্তা	৮২
উপসংহার	৮৭
পরিশিষ্ট	
নূরজাহান বেগমের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাক্ষাৎকার	৯৪
সহায়ক-গ্রন্থ	৯৮

401827

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

" 'বেগম' পত্রিকায় প্রতিফলিত বাঙালি মুসলিম-নারীর সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষাচিন্তা (১৯৪৭-১৯৭০)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ। ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে আমি বাংলা বিভাগে অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষের তত্ত্বাবধানে এম.ফিল. কোর্সে নিবন্ধন লাভ করি এবং তাঁর ও অধ্যাপক ডক্টর রফিকউল্লাহ খান-এর নিকট প্রথম পর্বের কোর্সসমূহ অধ্যয়ন করি।

অভিসন্দর্ভ রচনার প্রতিটি পর্যায়ে আমি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ-এর জ্ঞানগর্ভ অভিমত এবং সহৃদয় সহযোগিতা পেয়েছি। অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও প্রাজ্ঞ নির্দেশনা আমাকে গবেষণাকর্মটি সমাপ্ত করতে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। এছাড়াও তাঁর নিরন্তর তাগিদ ও উৎসাহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে প্রতি মুহূর্তে। আমি তাঁর কাছে আন্তরিক ও সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এরপর বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় অধ্যাপক ডক্টর রফিকউল্লাহ খানের কথা। 'বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের উপন্যাস' শীর্ষক কোর্সের শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রগাঢ় প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে আমি আসি। তখন থেকেই গবেষণাকর্ম সম্পাদনে তিনি আমাকে উৎসাহ যুগিয়ে আসছেন। আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

আমি কৃতজ্ঞ সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকার সম্পাদক নূরজাহান বেগম-এর নিকট। ঢাকার কোন লাইব্রেরীতে ১৯৪৭-১৯৬২ সময়কালের 'বেগম' পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষিত না থাকায় আমাকে তাঁর দ্বারস্থ হতে হয়। নিজ বাড়িতে অত্যন্ত যত্নে সংরক্ষিত দুর্লভ 'বেগম'-এর প্রতিটি সংখ্যা এই অচেনা, অজানা গবেষককে সরবরাহ করে আমার অশেষ উপকার সাধন করেছেন তিনি। তথ্য সংগ্রহের মূল কাজে সহায়তার জন্যে আমি নূরজাহান বেগম ও 'বেগম' পত্রিকার সকল কর্মী, সাংবাদিকদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাস্পদ কবি ডক্টর তপন বাগচী'র নিকট। সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্রী হয়ে বাংলা বিভাগে এম.ফিল. গবেষণায় অন্তর্ভুক্তির সার্বিক কৃতিত্বের দাবিদার তপন বাগচী। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বন্ধুবর মাসুম আহমেদের নিকট। পেশাগত কারণে চট্টগ্রামে অবস্থান করার দরুণ গবেষণার তথ্যসংগ্রহ, তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে যোগাযোগ কিংবা গ্রন্থাগার ব্যবহার– সবক্ষেত্রেই এক অনিবার্য টানাপোড়েন তৈরী হয়। স্থানিক দূরত্বের এই টানাপোড়েনের ফারাক হাসিমুখে পূরণ করেছেন তিনি।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ সূত্রে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারিবৃন্দকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

'বেগম' (১৯৪৭) উপমহাদেশে মুসলিম মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা। সুফিয়া কামাল ও নূরজাহান বেগমের যুগ্ম-সম্পাদনায় ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই কলকাতা থেকে 'বেগম'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৭৭৮ সালে উপমহাদেশের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর জনগোষ্ঠী সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের পাশাপাশি মুসলমান পুরুষগণ এগিয়ে গেলেও মুসলিম নারীসমাজ একেবারেই পিছিয়ে ছিল। মুসলিম নারীসমাজের এই বন্ধ্যাত্ব মোচনে লেখনী ধারণ করেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তাঁরই হাত ধরে এগিয়ে আসেন বেগম সুফিয়া কামাল, নূরজাহান বেগম প্রমুখ। শিক্ষাবিস্তার ও সাহিত্যরচনার পাশাপাশি পত্র-পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রেও তাঁরা এগিয়ে এলেন। ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে 'আন-নেসা', 'বুলবুল', 'রূপরেখা', 'বেগম', 'মুক্তি' প্রভৃতি পত্রিকা। কিন্তু পত্রিকাগুলোর কোনটিই দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারে নি। একমাত্র 'বেগম'-ই নারী সম্পাদিত পত্রিকা হিসেবে অর্ধ শতাব্দীর সীমানা অতিক্রম করে আজ অবধি প্রকাশিত হয়ে আসছে।

যে কোন দেশ বা জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সাময়িকপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রসমূহই সেই জাতির রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, লোকাচার তথা জাতিসত্তার স্বকীয় সকল ক্ষেত্রসংশ্লিষ্ট সমকালীন চিন্তাচেতনাকে ধরে রাখে। এক কথায় সাময়িকপত্র হচ্ছে ইতিহাসের উপাদান যোগানদার। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় সাময়িকপত্রসমূহ প্রাথমিক উৎস হিসেবে কাজ করে। ১৯৪৭ হতে ১৯৭০ কাল-পরিসরে বাঙালি মুসলিম নারীর সামাজিক সাংস্কৃতিক চিন্তার স্বরূপ উদঘাটনে তাই আমরা সাময়িকপত্রকে বেছে নিয়েছে। এ সময়ে বাঙালি মুসলিম সমাজ ব্যাপৃত ছিল তার আত্মপরিচয়ের সন্ধানে। বাঙালি মুসলিম সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে নারীসমাজও তখন সচেতন হয়েছে, তার অস্তিত্বের শেকড় সন্ধানে এবং নিজেকে বিকাশের প্রেরণায়। বাঙালি মুসলিম নারীসমাজের এই বিকাশকে ত্বরান্বিত করার মানসে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আবির্ভূত হয় একমাত্র 'বেগম' পত্রিকা। নারীসমাজের বিভিন্ন খবর, নারী আন্দোলনের নানা বিষয়ের উপর মতামত প্রকাশ করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, মহিলা সাহিত্যিকদের সাহিত্য-সাধনার সুযোগ সৃষ্টি করা, গ্রামবাংলার মেয়েদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো ইত্যাদি মানসে প্রকাশিত 'বেগম' পত্রিকার আবির্ভাব অবশ্যই বাঙালি মুসলিম নারীসমাজের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ধর্মের ভিত্তিতে স্বাধীন হওয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালি মুসলিম নারীর সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষাচিন্তার স্বরূপ ও প্রকৃতি অনুসন্ধানে তাই গবেষণা প্রকল্প হিসেবে 'বেগম' পত্রিকাটি বেছে নিয়েছি।

বর্তমান গবেষণার সময় ১৯৪৭-১৯৭০। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৪৭-১৯৭০ কাল-পরিসর ছিল বাঙালি জাতির জন্য কী রাজনৈতিক, কী সামাজিক, কী সাংস্কৃতিক দিক থেকে অত্যন্ত ঘটনাবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও শুধু ধর্মের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রভুক্ত হওয়া এবং তার সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টার অভিজ্ঞতা বাঙালির জন্য ছিল অনেক বেশী বেদনাবিধুর। '৪৭-এর দেশভাগ থেকে শুরু

Dhaka University Institutional Repository

করে '৪৮-'৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন— বাঙালির ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। সামরিক শাসন জারি হওয়ার পরবর্তী বছরগুলোর পাশাপাশি '৬০-এর দশকের সাহিত্য আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাস ও নির্বাচন— অর্থাৎ সবমিলিয়ে '৫০, '৬০, '৭০-এর দশক বাঙালি জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনায় রেখে ১৯৪৭-১৯৭০ সময়পর্বকে গবেষণার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় তথ্যসংগ্রহে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis) অনুসরণ করা হয়েছে। ১৯৪৭-১৯৭০ কাল-পরিসরের সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় এবং প্রবন্ধ ও নিবন্ধকে গবেষণা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ 'বেগম'-এ প্রকাশিত (১৯৪৭-১৯৭০) সম্পাদকীয় এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধ-কে বিশ্লেষণ করে বাঙালি মুসলিম নারীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাচিন্তার স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। একটি পত্রিকার মূলবার্তা (Message), ভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায় তার সম্পাদকীয়তে। যে কোন বিষয়ে, কোন ইস্যুতে পত্রিকা নিজস্ব বক্তব্য, কিংবা পত্রিকাটি কোন মতাদর্শ সমর্থন করছে অথবা কোন মতাদর্শ প্রচার করতে যাচ্ছে— সবকিছুরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে সম্পাদকীয় বক্তব্যে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে 'বেগম' পত্রিকার চিন্তা-চেতনা, বিবেচনাবোধ কিংবা তার নিজস্ব বক্তব্য বোঝার এবং বিবেচনার সর্বোত্তম উপায় হিসেবে পত্রিকার সম্পাদকীয়কে গবেষণার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রবন্ধ এবং নিবন্ধকে গবেষণার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে, পত্রিকার নিজস্ব ভাবনার পাশাপাশি পাঠকদের চিন্তা-ভাবনা, তাদের বক্তব্য কিংবা অপরাপর লেখিকার লিখিত প্রবন্ধ, নিবন্ধে পত্রিকার আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধ, নিবন্ধ সর্বদা যে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় বক্তব্যকে সমর্থন করেছে তা নয়— কিন্তু সকল শ্রেণীর বাঙালি মুসলিম নারীর চিন্তা-চেতনার স্বরূপ বুঝতে তাদের লিখিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ-কে গবেষণা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছি।

"'বেগম' পত্রিকায় প্রতিফলিত বাঙ্গালি মুসলিম নারীর সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষাচিন্তা (১৯৪৭-১৯৭০)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে 'বেগম' পত্রিকার সাধারণ পরিচয় বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বেগম' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে প্রতিফলিত বাঙালি মুসলিম নারীর সমাজ- চিন্তা এবং তৃতীয় অধ্যায়ে 'বেগম' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত বাঙালি মুসলিম নারীর সংস্কৃতিচিন্তা আলোচিত হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজচিন্তা এবং সংস্কৃতিচিন্তা প্রপঞ্চ দুটোর মধ্যে ব্যবধান সেই অর্থে নেই বললেই চলে। যাও বা আছে তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম— প্রথমোক্তটি পরবর্তী প্রপঞ্চের তুলনায় ব্যাপকতর বলা যায় মাত্র। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যকে মাথায় রেখেই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিটি একীভূত করে 'বেগম' পত্রিকার প্রবন্ধে প্রতিফলিত বাঙালি মুসলিম নারীর সমাজ ও সংস্কৃতিচিন্তা শীর্ষক একটি একক শিরোনামায় চতুর্থ অধ্যায়টি সন্নিবেশিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'বেগম' পত্রিকায় প্রতিফলিত বাঙালি মুসলিম-নারীর ভাষাচিন্তা। উপসংহার অংশে রয়েছে বর্তমান গবেষণার সারাৎসার। তাছাড়া পরিশিষ্টি অংশে রয়েছে 'বেগম' পত্রিকার প্রতিষ্ঠালগ্নের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং ১৯৪৮ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫৫ বছর দায়িত্ব পালনরত সম্পাদক নূরজাহান বেগমের একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

'বেগম' পত্রিকা : সাধারণ পরিচয়

১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই (৩ শ্রাবণ, ১৩৫৪) রবিবার কলকাতা থেকে বাংলা ভাষায় মহিলাদের প্রথম সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেগম'* প্রকাশিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে 'বেগম' ছিল বাংলা ভাষায় মুসলিম পরিচালিত প্রথম সচিত্র মাসিকপত্র, 'সওগাত' (১৯১৮) সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (১৮৮৮-১৯৯৪)-এর উদারনৈতিক এবং প্রগতিশীল চিন্তার ফসল। বাংলা ভাষায় মুসলমানদের প্রথম মাসিকপত্র 'সওগাত' প্রকাশিত হবার পূর্বে বাংলার মুসলমান-সম্পাদিত আর কোনও পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি বা হত না, এমনটি নয়। ১৯১৮ সালে 'সওগাত' প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের যেসব মাসিক পত্রিকার পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— ইসলাম প্রচারক, মিহির (জানুয়ারি ১৮৯২), আখবারে ইসলামীয়া (১৮৮৪), হাফেজ (জানুয়ারি ১৮৯৭), কোহিনুর (১৮৯৮), আহলে হাদিস, ইসলাম দর্শন প্রভৃতি। তবে এই পত্রিকাগুলোর অধিকাংশই ইসলামধর্মের মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে বের হতো।[১] মুসলিম সমাজে শিল্প-সংস্কৃতির কোনও চর্চা না থাকায় যুগোপযোগী সাহিত্য বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা তাতে থাকতো না। মুক্তবুদ্ধি নিয়ে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। নানারকম বিধি নিষেধের মধ্যে লেখকরা আবদ্ধ ছিলেন।[২]

শুধু লেখকরাই নন, মুসলমানরা সকলেই ধর্মের দোহাই দিয়ে আড়ালে নানারকম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। তারা মনে করতো— 'যারা দুনিয়াতে গরিব থাকবে তারাই বেহেশতে যাবে, ধনী লোকেরা দুনিয়ার সুখই ভোগ করবে, বেহেশতের সুখ ভোগ করতে পারবে না। দুনিয়ায় মুসলমানদের জন্য আরাম-আয়েশ ও আমোদ-প্রমোদ হারাম।'[৩] ফলে হারাম মনে করে মুসলমানরা ইংরেজি পড়া থেকে নিজেদের বিরত রাখল। তারা মাতৃভাষার চর্চায় ছিল উদাসীন। আরবি ভাষায় মক্তবে শিক্ষালাভ করাই তারা যথেষ্ট বলে মনে করতো। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাতো দূরের কথা, খেলাধুলা, গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ সবকিছুই ছিল নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। অপরদিকে প্রতিবেশী হিন্দুসমাজ ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে চাকরি লাভে, কিংবা ব্যবসা ক্ষেত্রে ক্রমশ এগিয়ে চলতে থাকে। হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন তাদের এই এগিয়ে যাওয়াকে ত্বরান্বিত করে বিভিন্ন মাত্রায়। এই আন্দোলন হিন্দুদের ধর্ম ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন আনে। ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শ এবং হিন্দুসমাজ-কাঠামো ও ঔপনিবেশিক বাস্তবতার পরিসীমায় যতোটা সম্ভব প্রয়োজনীয় ও আধুনিকায়নের সপক্ষে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ

---

* সম্পাদক: বেগম সুফিয়া কামাল, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: নূরজাহান বেগম। কার্যালয়: ১২ নং ওয়েলেসলী স্ট্রীট, কলকাতা। মূল্য: বার্ষিক ১২ টাকা, প্রতি সংখ্যা চার আনা। আকৃতি ১/২ ডবল ক্রাউন। পৃষ্ঠা: ২০

Dhaka University Institutional Repository

করে তারা এগিয়ে গেল।[৪] সমাজ-সংস্কারের এই চেতনা বা উপলব্ধি মুসলমান সমাজে যে একেবারেই ছিল না, তা নয়। তবে মুসলমানদের এই উপলব্ধি এসেছিল অনেক পরে এবং তারপরও যারা এরূপ ভাবতেন তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রকাশ করতে সমর্থ হতেন না। কারণ সেই অন্ধকার যুগে স্বাধীন চিন্তা বা স্বাধীন মতবাদ প্রচার করা ছিল বিপজ্জনক।[৫] তাছাড়া মুসলমানদের জাগতিক উন্নয়নের বিষয়ে কথা বলতে পারে এরূপ পত্রিকাও ছিল না।

মুসলমানদের এরূপ অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য সাময়িকপত্রের ভূমিকা ছিল অনেক বেশী। এই উপলব্ধি থেকেই মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ১৯১৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন বাংলাভাষায় মুসলমানদের প্রথম সচিত্র মাসিকপত্র 'সওগাত'। বাস্তবিকপক্ষে মুসলমান সমাজের অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের যুগে প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করা বা সমাজ-সংস্কারমূলক কোনও কাজে অগ্রসর হওয়া এক প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই গোঁড়ামির যুগে 'সওগাত'-এর মতো একটি প্রগতিশীল সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন প্রগতিশীল চিন্তা ও কঠোর মনোবলের পরিচয় দেন। 'সওগাত' প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন—

> *একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকার আদর্শে মুক্ত যুক্তি ও স্বাধীন চিন্তা সমৃদ্ধ রচনা এবং চিত্র সম্ভারে এর অঙ্গসৌঠব বৃদ্ধি করে একে পাঠক সমাজে আকৃষ্ট করে তোলা, নবীন লেখক লেখিকাদের রচনা প্রকাশ করে সাহিত্য চর্চায় তাঁদের উৎসাহিত করা এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের সমাজে সাহিত্যিকের অভাব দূর করা।*[৬]

এতো গেল মুসলমানর সমাজে পুরুষদের কথা। কিন্তু নারীসমাজ? উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলার মুসলমান সমাজে জাগরণ শুরু হলেও প্রতিবেশী ব্রাহ্ম ও হিন্দু নারীদের তুলনায় মুসলমান নারীরা অনেকটাই পিছিয়ে ছিলেন। নওয়াব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহম্মদ প্রমুখ ব্যক্তি মুসলিম সমাজের জাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও নারীসমাজের জন্য তাঁরা সেরূপ কোনও ভূমিকা পালনে উদ্যোগী হতে পারেননি বা হননি। এক্ষেত্রেও এগিয়ে আসেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। বাংলার মুসলিম নারীদের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে তিনি 'সওগাত'-এর মাধ্যমে নারী-মুক্তি আন্দোলন পরিচালনার সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, সমাজের বৃহত্তর একটি অংশকে বাদ দিয়ে জাতীয় জীবনে কোনও সমৃদ্ধি তথা প্রগতির আন্দোলন এগিয়ে যেতে পারে না।[৭] এ কারণে 'সওগাত' প্রকাশের গোড়া থেকেই এতে ইসলামে নারীর অধিকার-বিষয়ক কতকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। ধর্মের নামে অধর্ম, অশিক্ষা, কুসংস্কার এসব অন্যায়ের মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে ১৯২৭ সালে 'সওগাত'-এর সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন 'জানানা মহল' নামে সচিত্র মহিলা বিভাগ চালু করেন।[৮]

'সওগাত' প্রকাশের সূচনালগ্ন থেকে নারীসমাজের প্রাপ্য যথার্থ সম্মান তাতে প্রদর্শন করা হয়। 'সওগাত'-এর মধ্য দিয়ে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা সামাজিক উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণের জন্য মেয়েদের উৎসাহিত করার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এজন্যই 'সওগাত' তার

Dhaka University Institutional Repository

স্লোগান নির্ধারণ করে 'নারী না জাগলে, জাতি জাগবে না'। বার্ষিক ও সাপ্তাহিক 'সওগাত'-এ মহিলাদের লেখাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু যে সমাজে নারীর বিদ্যাশিক্ষা বা জ্ঞানার্জন ছিল নিষিদ্ধ, সে-সমাজে মহিলা লেখিকার আবির্ভাব ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার। কঠোর অবরোধ ও নিষেধের মধ্যে থেকেও যাঁরা নিভৃতে সাহিত্য চর্চা করতেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তাঁদের খুঁজে বের করেন এবং 'সওগাত'-এর বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ করে 'জানানা মহল'-এ লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। এভাবে যখন মেয়েরা কিছু কিছু লিখতে শুরু করলেন, তখন তিনি শুধু মেয়েদের লেখা দিয়ে বছরে একবার 'সওগাত'-এর একটি সংখ্যা বের করার চেষ্টা করেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে 'সওগাত'-এ মহিলা সংখ্যার জন্য মেয়েদের লেখা ও ছবি আহ্বান করা হয়। যে দেশে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের কোনও সাময়িক পত্রিকাও সে-সময় পর্যন্ত মহিলা সংখ্যা প্রকাশ করেনি, সেখানে শিক্ষা-দীক্ষায় অনুন্নত মুসলিম সমাজের অবরোধবাসিনী মহিলাদের রচনা ও ছবি নিয়ে বিশেষ মহিলা সংখ্যা প্রকাশ করা ছিল রীতিমতো দুঃসাহসের কাজ। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সেই দুঃসাহসিক কাজ সমাধা করলেন তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। কেবল মুসলমান মহিলাদের রচনা ও ছবিসহ প্রথম মহিলা 'সওগাত' প্রকাশিত হলো বাংলা ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে।[৯] এটিই ছিল হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের প্রথম সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা।[১০] তবে এই মহিলা 'সওগাত' তিনি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি। যখনই তিনি মহিলাদের কিছু কিছু লেখা সংগ্রহ করতে পেরেছেন, তখনই তিনি মহিলা 'সওগাত' সংখ্যা বের করেছেন।[১১]

মহিলাদের জন্য মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সর্বশেষ প্রচেষ্টা সচিত্র সাপ্তাহিক 'বেগম'। মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেগম'। মূলত 'সওগাত'-এর মহিলা সংখ্যার স্থলে 'বেগম'-এর কথা ভাবা হয় এবং 'বেগম'-এর মাধ্যমে হয়তো অনেক লেখিকা ও সমাজকর্মীর আবির্ভাব হবে[১২] এই প্রত্যাশা নিয়ে ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই কলকাতার ১২ নং ওয়েলসলী স্ট্রীট থেকে 'বেগম' প্রথম প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক 'বেগম'-এর প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ করা হয়েছিল মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ছবি দিয়ে। 'বেগম'-এর আগমনে তৎকালীন অনেক নেত্রীস্থানীয়া মহিলারা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিলেন। প্রথম সংখ্যাতে এই শুভেচছা বক্তব্যসমূহ প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন জনের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মূল কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হল—

বেগম সুফিয়া কামাল

> *কৃষ্টির ধারা বাহন ও সমৃদ্ধি সাধনের একমাত্র সহায় সাহিত্য। সেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজো আমরা প্রায় উদাসীন। মুসলিম নারীসমাজে সাহিত্য সংস্কৃতির প্রসার হইতে পারে আমাদের নিজস্ব এমন কোন বাহনের প্রতিষ্ঠা আজ পর্যন্ত হয় নাই।*
>
> *বর্তমানে এই নব জাগরণের দিনে, নতুন জাতীয় সংগঠনের যুগসন্ধিক্ষণে মুসলিম নারীদের এই লজ্জাকর দারিদ্র্য আরো করুণ চেহারায় আমাদের অন্তর ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে। এইজন্যই বহুবিধ বাধা বিঘ্ন ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সাপ্তাহিক 'বেগম'-মুসলিম নারীসমাজের খেদমতে*

Dhaka University Institutional Repository

হাজির হইল। সহৃদয় লেখিকা, গ্রাহিকা ও পাঠিকাদের সহযোগিতাই হবে 'বেগম'-এর শ্রেষ্ঠ সম্বল— আর সম্বল পরম করুণাময় আল্লাহ তালার রহমত।

অধ্যাপিকা শামসুন নাহার (এম.এ.)

আজ ভারতের মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্যের অভ্যুদয় হচ্ছে। এই নব অরুণোদয় ক্ষণে মেয়েদের স্থান শূন্য থাকবে না, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। মুসলিম ভারতের যে নতুন ইতিহাস রচিত হতে চলেছে— সকলের মিলিত দানে সে ইতিহাস সমৃদ্ধ হোক।

আজকে এই জয়যাত্রার পথে অন্য কারুর তুলনায় বাংলার মেয়েদের হাতের মশাল যে কোন অংশে হীন তেজ হবে না এ-কথা জোর গলায় বলতে আর দ্বিধাবোধ করবার কোন কারণ নেই। এই যুগ সন্ধিক্ষণে মেয়েদের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেগম'-এর প্রতিষ্ঠা ও প্রচার সার্থক গৌরবমণ্ডিত হোক, আল্লাহর সমীপে ইহাই প্রার্থনা।

আরো যাঁদের শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রকাশ করা হয় তাঁরা হলেন মিসেস এইচ. এ. হাকিম এম.এল.এ. মিসেস বদরুন্নেসা আহমদ, বেগম সৈয়দা ফেরদৌস মহল শিরাজী, মিসেস জাহান আরা মজিদ, কাজী লুৎফুন্নেসা হারুন, বেগম ফিরোজা রহমান, নূরজাহান বেগম, বেগম জোবেদা খাতুন, মিসেস আমিনা চৌধুরী এবং মিসেস আনোয়ারা বেগম। শুভেচ্ছা বক্তব্য ছাড়া আর যে-বিষয়গুলো প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছিল তা হল— আলোক দূতী রোকেয়া সাখওয়াৎ- রাবেয়া মাহমুদ, প্রবন্ধঃ পুরুষের প্রিয়া জাগো— সেলিনা পন্নী, গল্পঃ সুচিশিল্প– ওয়াহিদা আজিজ, চিত্রশালা, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য, পাকিস্তান ও ভারতের খ্যাতনামা মহিলাদের ছবি, মুসলিম মহিলা ন্যাশন্যাল গার্ড, ঘরকন্না, বর্ষার দিনে, ছায়াছবির কথা, ইরানে নারী আন্দোলন, বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষা, বিজ্ঞানের কথা, দেশবিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর। লক্ষণীয় যে, এই সংখ্যায় মেয়েদের কোনও কবিতা প্রকাশিত হয় নি।

প্রথম সংখ্যা 'বেগম'-এর সম্পাদকীয় ছিল নিম্নরূপ :

মুসলিম সমাজ আজ এক কঠোর দায়িত্ব গ্রহণের সম্মুখীন। অর্জিত স্বাধীনতার সম্মান ও গৌরব অক্ষুণ্ন রাখতে হলে কেবল পুরুষেরই নয়, মুসলিম নারীকেও এগিয়ে আসতে হবে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের কাজে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ নারীসমাজকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে তারা সেই স্বাধীন সার্বভৌম আদর্শ রাষ্ট্রের সত্যিকার দাবীদার হতে পারে সগৌরবে।

এর জন্য চাই আমাদের মানসিক প্রসার— আশা আকাঙ্ক্ষার ব্যপ্তি আর জীবন সম্বন্ধে এক স্থির ধারণা।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু জীবনের প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টিপাত সম্ভব কেবল সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যস্থতায়। অথচ সাহিত্য শিল্প চর্চ্চায় আমরা এখনো উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকারে সক্ষম হইনি। এর কারণ নানাবিধ তবে মহিলাদের জন্য সাময়িক পত্রিকার সম্পূর্ণ অভাব এর প্রধানতম কারণ।

সুধী ব্যক্তিরা বলেন, জাতি গঠনের দায়িত্ব প্রধানত নারীসমাজের হাতে— কথাটা অনস্বীকার্য নয়। এবং এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে হলে পৃথিবীর কোনো দিক থেকেই চোখ ফিরিয়ে থাকলে আমাদের চলবে না। এ-কথাও মানতে হবে। শিল্প, বিজ্ঞান থেকে শুরু করে গৃহকার্য ও সন্তান পালনে সর্বক্ষেত্রে আমরা সত্যিকার নারীরূপে গড়ে উঠতে চাই।

আল্লাহর রহমতে 'বেগম' সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হলো।

নব জাগ্রত মুসলিম নারীসমাজের আন্তরিক সহযোগিতা পেলে 'বেগম'-এর দ্রুত উন্নতি সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

'বেগম' প্রকাশের ভার আমরা গ্রহণ করলাম। কিন্তু এর দীর্ঘায়ু ও সমৃদ্ধির দায়িত্ব সমাজের প্রত্যেক নারীর উপর ন্যস্ত রইলো। কারণ নারীসমাজের বাণী বাহক হিসেবে প্রত্যেকেই 'বেগম'-এর সমান দাবীদার। তাদের সর্বপ্রকার সহায়তাই সেই দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

প্রথম বর্ষ ৪২ সংখ্যা পর্যন্ত 'বেগম' কলকাতার ১২নং ওয়েলেসলী স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর নিজস্ব ভবন ২০৩ নং পার্ক স্ট্রীটে কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫০-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি ৩য় বর্ষ ২৪ সংখ্যা পর্যন্ত 'বেগম' কলকাতার পার্ক স্ট্রীট কার্যালয় থেকেই প্রকাশিত হয়। এ সময় ভারতের সর্বত্র প্রচণ্ড দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে দেশ বিভক্ত হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ১৯৫০ সালের মে মাসে 'বেগম' ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। এ সময়ের গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি এবং ঢাকায় স্থানান্তরজনিত কারণে সাময়িকভাবে 'বেগম' প্রকাশ বন্ধ থাকে। এ সংক্রান্ত ঘোষণায় (৩য় বর্ষ ২৪শ সংখ্যা, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০) ৩রা মার্চ থেকে নিয়মিতভাবে 'বেগম' প্রকাশের কথা বলা হলেও পরবর্তীতে ৪র্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৩ ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে। ঢাকায় 'বেগম'-এর কার্যালয় ছিল ৬৬ পাটুয়াটুলী এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত এই স্থান থেকেই 'বেগম' প্রকাশিত হয়ে আসছে।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'বেগম'-এর আকৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়। $^{১}/_{২}$ ডবল ক্রাউন থেকে $^{১}/_{৪}$ ডবল ক্রাউন করা হয় এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ২৬। ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যার পর পত্রিকাটিকে পূর্বের আকারে ফিরিয়ে নেয়া হয়। কলকাতায় থাকাকালীন বেগমের সার্কুলেশন ছিল ২ হাজার কপি, ঢাকায় এসে সার্কুলেশন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় সাড়ে তিন থেকে চার হাজার কপি। পত্রিকাটি এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রি হত, এর পাশাপাশি সরাসরি গ্রাহক হবার ব্যবস্থাও ছিল।[১৩]

'বেগম'-এর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই 'বেগম' ঈদ সংখ্যা প্রকাশ করে আসছে। ১৯৪৯ সালে (শ্রাবণ ১৩৫৬ সাল) বের হয় 'বেগম'-এর প্রথম ঈদ সংখ্যা। এরপর স্থান পরিবর্তনের কারণে ১৯৫০ সালে ঈদ সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। ১৯৫৪ সাল থেকে পুনরায় নিয়মিতভাবে ঈদ সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে আসছে। ঈদ সংখ্যার পরে 'বেগম' থেকে উদ্যোগ নেয়া হয় বিশ্বনবী সংখ্যা প্রকাশ করার। এরপর ক্রমান্বয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র জন্ম

Dhaka University Institutional Repository

ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু দিনে বিশেষ সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।

'বেগম'-এর নিয়মিত বিভাগের মধ্যে ছিল সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস, জীবনী, সচিত্র মহিলা জগতের খবর, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য, প্রশ্ন ও উত্তর, ডাক্তার বলেন, রম্যরচনা, সেলাই, রান্না, শিশু মহল, হালচাল, চিঠিপত্র, পুস্তক সমালোচনা, ছায়াছবির কথা, শিক্ষা, পল্লী উন্নয়ন, সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদসহ কয়েকটি সচিত্র বিভাগ।

১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর থেকে (৭ম বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা) সংগ্রামী জীবন নামে একটি নতুন বিভাগ শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদিকা বলেন—

> *পরিবেশের প্রতিকূলতা এবং দেশাচারের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে বহু নারী কেবল মাত্র স্বকীয় সংগ্রামী চেতনাবলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরা হয়তো তাঁদের সবারই খবর জানি না। তাঁদের জীবন এবং আত্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আমাদের সকলেরই আদর্শ স্বরূপ। এই বিভাগটিতে এই সব সংগ্রামী চেতনার উপল ব্যথিত জীবনধারার ইতিকথা পরিবেশনের ইচ্ছা রইল।*

বিভাগটিতে ধারাবাহিকভাবে বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ, কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, জোবেদা খানম, আশালতা সেন, বেগম রোকাইয়া আনওয়ার প্রমুখের জীবনী ও সাধনা আলোচনা করা হয়।

৫ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা থেকে শিশুদের জন্য নতুন বিভাগ 'শিশু মহল' প্রকাশ করা হয়। এই বিভাগটি সম্পর্কে সম্পাদিকা বলেন—

> *তোমাদের অনুরোধে এই বিভাগ খোলা হল। এখানে মকশো করে হাত পাকাতে পারবে। এবার তোমরা খুশী হয়েছো নিশ্চয়ই।*

এই বিভাগে শিশুর শারীরিক-মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনার মধ্য দিয়ে মূলত শিশুকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার দিকনির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। যেমন— শিশুকে সামাজিক করে গড়ে তোলা, শিশুর জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব, শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা, এক বছরের শিশুকে নিয়ে মায়ের সমস্যা, শিশুর চরিত্র গঠন, শিশুর দেহ গঠনে ঘুমের প্রয়োজনীয়তা, শিশু যখন খেতে চায় না, শিশুর খেলা, মানসিকতার ভিত্তি, দুই বছরের শিশুর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন, শিশুর কল্পনা, শিশুর কু-অভ্যাস, আঙ্গুল চোষা, শিশু মনের উৎকণ্ঠা, নবজাত শিশুর দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন, শিশুদেহে ভিটামিনের প্রয়োজনীয়তা, শিশুর শিষ্টাচার শিক্ষা, শিশুর অনুভূতি, শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা, শিশুর মিশুক স্বভাব তৈরিকরণ, পিছিয়ে পড়া শিশু, শিশু প্রথম যেদিন স্কুলে যাবে, শিশুর পরিবেশ ও সঙ্গী সাথী, শিশুরা যখন পড়তে চায় না ইত্যাদি।

'বেগম'-এর ১৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যা (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩) থেকে এম. হুসনা বানু খানম রচিত 'আমেরিকার শিক্ষা ও সংস্কৃতি' শিরোনামে একটি ধারাবাহিক রচনা প্রকাশ করা হয়। মূলত লেখিকা যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য অর্থনীতি ও কারুকলা বিষয়ে এম.এস.সি.

Dhaka University Institutional Repository

ডিগ্রি লাভের জন্য অবস্থানকালে আমেরিকার মানুষ, জীবনযাত্রা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে যতটা দেখেছেন— এই রচনায় তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

'বেগম'-এর ১৭শ বর্ষ ২৫ সংখ্যা (২৮জুন, ১৯৬৪) থেকে ছোট্ট কলেবরে আর একটি ধারাবাহিক অধ্যায় শুরু হয় 'জীবন ও জীবিকা' শিরোনামে। এই অধ্যায়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর এবং গ্রাম এলাকা, এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত নারীকে তুলে আনা হয়। সামান্য ঝাড়ু-দার কিংবা চায়ের দোকানদার থেকে শুরু করে বিমানবন্দরে কর্মরত তথা সর্বস্তরের কর্মরত নারীদের ছবি এবং পরিচিতি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হয় এই অধ্যায়ে। মূলত কর্মরত নারীদের জীবিকা তুলে আনার মধ্য দিয়ে তাবৎ নারীসমাজকে উদ্দীপিত করার পাশাপাশি কর্মরত নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনও ছিল এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য।

'বেগম'-এর নিয়মিত লেখিকাদের মধ্যে ছিলেন তাহমিনা বানু, নাসিমা বানু, মঞ্জুলিকা দাসগুপ্ত, প্রতিভা গাঙ্গুলী, এম হুসনা বানু খানম প্রমুখ। তাছাড়া আরো যারা বিভিন্ন সময়ে লেখা দিয়ে 'বেগম'-এর যাত্রা সচল রেখেছিলেন তাঁরা হলেন— সেলিনা পন্নী, রাজিয়া খাতুন, রাবেয়া খাতুন, জাহানারা আরজু, নুরুন নাহার, বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, আঞ্জুমান আরা বেগম, জোবদো খানম, রাজিয়া মাহবুব, বেগম সিতারা আহমদ, সৈয়দা লুৎফুন্নেসা, মঞ্জুশ্রী দত্ত, হাজেরা নজরুল, জুবাইদা গুলশান আরা, মকবুলা মন্‌জুর, ঝর্না দাশ পুরকায়স্থ প্রমুখ। অনেক সময় প্রয়োজনীয় লেখার অভাবে 'বেগম' অনুবাদকর্ম দিয়ে কাজ চালাত। 'বেগম'-এর একজন নিজস্ব আলোক চিত্রশিল্পী ছিলেন— সাঈদা খানম। ৫০-এর দশকে এই রক্ষণশীল সমাজে মহিলা আলোকচিত্র শিল্পীর আবির্ভাবও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বেগম ক্লাবের প্রতিষ্ঠা

'বেগম'-এর সেবাব্রতকে আরো সুদূরপ্রসারী করার জন্যে এবং মহিলাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের কাজ চালানোর জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৫৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর বেগম শামসুন নাহার মাহমুদকে প্রেসিডেন্ট এবং নূরজাহান বেগমকে সেক্রেটারি করে 'বেগম ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'বেগম' প্রতিষ্ঠার পিছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি সেই মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের প্রত্যক্ষ কর্মপরিচালনায় এবং 'বেগম'-এর শুভাকাঙ্ক্ষীরা মিলে এই 'বেগম ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন। তবে এক্ষেত্রে মার্কিন মহিলা সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী মিসেস আইদা আলমেন-এর নাম উল্লেখ না করলেই নয়। প্রকৃতপক্ষে মিসেস আইদা আলমেন-এর 'বেগম' অফিস পরিদর্শন উপলক্ষে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সমাজসেবী 'বেগম' অফিসে একত্রিত হন। মূলত তখনই 'বেগম ক্লাব'-এর বীজ রোপিত হয়।

'বেগম ক্লাব'-এর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 'বেগম' সম্পাদিকা নূরজাহান বেগম বলেন—

> *বাংলার মহিলা সমাজের উন্নয়নের জন্য এ-পর্যন্ত 'বেগম' যা কিছু করেছে প্রায় সকলেই তা অবগত আছেন। 'বেগম'-এর সেবাব্রতকে আরো সুদূরপ্রসারী করার জন্য 'বেগম'-এর লেখিকা,*

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠপোষক ও অন্যান্য সাহিত্যিকের সমবায়ে একটি সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি। মহিলাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের কাজ চালানোর জন্য একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমিতির মাধ্যমে একদিকে যেমন আমরা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি ও উৎসবাদি উদযাপন করতে পারবো, অপরদিকে তেমনি আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কথাও সংঘবদ্ধভাবে চিন্তা করতে পারবো। আমদের সম্মিলিত চেষ্টায় ও পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হবে।[১৪]

'বেগম ক্লাব' ১৯৭০ সাল পর্যন্ত দেশের বহু মহিলা কবি, সাহিত্যিক, সমাজসেবীকে গুণীজন সংবর্ধনা দিয়েছে। এদের মধ্যে আছেন সারা তৈয়ুর, বদরুন্নেসা আহমেদ, নুরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা প্রমুখ।

অন্দরমহলের অন্ধকার থেকে এদেশের নারীসমাজকে বাইরের উদার আঙ্গিনায় নিয়ে আসা, কর্মক্ষেত্রের বিরাট মিছিলে পুরুষের পাশাপাশি নারীকে দাঁড় করানো, অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিল্প, সংস্কৃতির অঙ্গনেও নারীর আবির্ভাব ত্বরান্বিত করার মানসেই ঘটেছে 'বেগম'-এর সচেতন, আত্মপ্রত্যয়ী আবির্ভাব। বলা যায়, সেই ১৯৪৭ সাল থেকে অদ্যাবধি 'বেগম' এ দেশের মহিলাদের আত্মপ্রকাশের অধিকার দানকারী একমাত্র পত্রিকা ।

তথ্যসংকেত

১. *মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ (জুলাই, ১৯৮৫), পৃ. ২৬*
২. *প্রাগুক্ত।*
৩. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৮*
৪. *প্রীতিকুমার মিত্র, হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), তৃতীয় খণ্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৫৯*
৫. *মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, প্রাগুক্ত।*
৬. *প্রাগুক্ত।*
৭. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২*
৮. *রায়হানা হোসেন ও কাজী মদিনা, তোমারি কথা বলবো, জনান্তিক প্রকাশনা, ঢাকা, ২০০৩ পৃ. ৮৩*
৯. *মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯*
১০. *রায়হানা হোসেন ও কাজী মদিনা, প্রাগুক্ত।*
১১. *রেজিনা বেগম, বেগম পত্রিকা ও পূর্ব বাংলার নারীসমাজ (১৯৪৭-৫৮), ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ।*
১২. *প্রাগুক্ত।*
১৩. *মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪৩*
১৪. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

'বেগম' পত্রিকার সম্পাদকীয়: সমাজভাবনা

শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা, সামাজিক অনুন্নতি, রাজনৈতিক ক্ষমতার অনুপস্থিতি, অর্থনৈতিক দুরবস্থা প্রভৃতি কারণে প্রায় পুরো উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমান সমাজে তথা ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান সমাজে চরম অবনতি ও অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের অবক্ষয়ের যুগে বাঙালি মুসলিম নারীসমাজের আর্থসামাজিক অবস্থা মুসলমান পুরুষদের চেয়ে ছিল অধিকতর করুণ ও বেদনাদায়ক। কারণ মানব সভ্যতার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে কোনও পতনমুখী ও অবক্ষয় আক্রান্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নারীজাতির অধঃপতিত ও করুণ অবস্থা। 'বেগম' পত্রিকার সম্পাদকীয়ের পুরোটা জুড়ে ছিল এই অধঃপতিত ও করুণ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নারীদের প্রতি আহ্বান। এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে নারীর কর্মময় জীবনকে। কিন্তু এ কর্মজীবনে গৃহের বাইরের চেয়ে গৃহের অভ্যন্তরেই নারীর ভূমিকা বেশি বলে সম্পাদকীয়তে মনে করা হয়। '৪৭-এর দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই পুরো সমাজব্যবস্থাই ছিল কিছুটা বিশৃংখল— যার ঢেউ লাগে বাঙালি মুসলিম সমাজের পারিবারিক জীবনেও। এই বিশৃংখল পরিবারে প্রথমে শৃংখলা এনে তারপর সমাজের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে পদচ্ছাপ রাখার জন্য বলা হয় সম্পাদকীয়তে। এ প্রসঙ্গে ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়—

> *আমাদের প্রাথমিক প্রয়োজন উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের নারীসমাজে উপযুক্ত গৃহিণী তৈরী করা – কিছু সংখ্যক ধাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ও ডাক্তার প্রভৃতি তৈরী করা। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এই আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য।*
>
> *তারপর শিক্ষার প্রসার যত বাড়তে থাকবে ততই আমাদের মধ্যে সমাজ সচেতনতা জাগবে এবং নতুনতর ও উন্নততর আয়ের সন্ধানও আমরা পাব। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সাধারণভাবে মেয়েদের চাকুরী স্পৃহার ফল ভাল না হয়ে, আরো অমঙ্গলজনক হবে। কাজ কোথায়, কাজ দেবে কে, যেখানে পুরুষেরাই কাজের অভাবে অকর্মণ্য, অর্থহীন ও কষ্টকর জীবন যাপন করছে।*

মেয়েদের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র এবং কাজের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে বলা হয়—

> *কাজের স্বাধীনতা মানেই পুরুষের সমকক্ষতা অর্থাৎ তার উপযুক্ত কাজগুলিতে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার অস্বাভাবিক চেষ্টা নয়। নিজের উপযুক্ত কাজ করবার ক্ষমতা অর্জন এবং স্বাধীনভাবে তা করতে পারার নামই স্বাধীনতা। মেয়েদের সে কাজ বাইরের চেয়ে গৃহে বেশী, কারখানার চাইতে হাসপাতালে বেশী, আইনসভার চাইতে স্কুল কলেজে বেশী।*[১]

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়ে 'বেগম'-এ নারীর কর্মক্ষেত্র হিসেবে গৃহকেই প্রাধান্য দেয়া হলেও ধীরে ধীরে 'বেগম'-এর এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হতে থাকে। একসময় 'বেগম' ঘরের কাজের পাশাপাশি বাইরের কর্মক্ষেত্রেও নারীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়; গুরুত্ব তুলে ধরে মেয়েদের স্বাধীন জীবিকার। এ প্রসঙ্গে বলা হয়—

> *বিবাহিত জীবনে মাতৃত্বের দাবী পূরণ করেও অর্থোপার্জন এবং জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব কিনা আধুনিকা নারীর কাছে আজ এই সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা উত্থাপিত হয়েছে।*
>
> *মেয়েদের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের পথে প্রথম বাধা হচ্ছে স্ত্রী উপার্জন করুক, উপার্জনক্ষম বহু স্বামী তা পছন্দ করেন না। তাঁরা মনে করেন এতে পৌরুষের লাঘব হয়ে থাকে। কিন্তু এই জাতীয় স্বামীদের জেনে রাখা ভাল যে, নর ও নারী উভয়েরই উপার্জনের জন্মগত অধিকার আছে। স্বামী কতৃর্ক স্ত্রীর উপার্জনের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করা স্বার্থপরতারই পরিচায়ক। আর সামান্য হাত খরচার জন্যও স্বামীর মুখাপেক্ষী হওয়া অনেক স্ত্রী ভালো কাজ মনে করেন না। অবশ্য অর্থোপার্জন করতে গিয়ে সন্তান পালন ও সংসার রক্ষায় যাতে বিশৃঙ্খলা না ঘটে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দুকূল বাঁচিয়ে যদি কোন নারী উপার্জন করতে পারেন তাতে বাধা দেওয়া কখনই সমীচীন নয়।*
>
> *এই ধরনের উপার্জনক্ষম নারী যে বর্তমান সমাজের আদর্শস্থানীয়া, তা স্বীকার করতেই হবে। বিবাহিত জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটা অর্থের উপরেই নির্ভর করে। বর্তমানে যে অর্থনৈতিক দুর্যোগ চলছে, তাতে কম অর্থে সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে। যেদিক দিয়েই হোক রোজগার বাড়ানো দরকার। স্বামী যদি উপার্জনের মাত্রা বাড়াতে না পারেন, তাহলে স্ত্রীকেই বাড়তি অর্থের সংস্থান করতে হবে। অন্যথায় সংসারে বিপর্যয় ঘটার আশংকা থেকে যায়।*[২]

মূলত মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার আর্থিক টানাপোড়েনই দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন ঘটাতে নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক, সামাজিক তথা জাতীয় জীবনে অর্থের প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হয়— যে সমাজের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় নয়, সেখানে মানব জীবনের সর্বোত্তম উৎকর্ষের প্রশ্ন তলিয়ে যায়। সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, উজ্জ্বল জীবনের কল্পনা অনেকটা জাতির অর্থনৈতিক সফলতার উপরই নির্ভরশীল। আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করার এই তাড়না থেকেই নারীর আর্থিক স্বাধীনতা লাভ কিংবা অর্থ উপার্জন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের বোধটি সামনে চলে আসে। আদিযুগের শুরুতে বিশেষত পশুপালন নির্ভর সমাজে নারীর কর্তৃত্ব বিদ্যমান ছিল। এর অব্যবহিত পরে সমাজে পুরুষ ও নারীর মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে নারীজাতি তার স্বাধীন সত্তা হারিয়ে জড়জীবে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা দেশ কিংবা সমাজের জন্য কল্যাণকর নয়। তাই জাতীয় অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন পুরুষ ও নারীকে তাদের যোগ্যতানুযায়ী প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করা। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের পটভূমি ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে নারীকে ঘরের বাইরের কর্মক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করার অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ৪র্থ বর্ষ ২৭শ সংখ্যায় 'মেয়েদের অর্থনৈতিক জীবন' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে—

Dhaka University Institutional Repository

একেবারে আদিম যুগে নারী পুরুষ উভয়েই বেঁচে থাকার জন্য উৎপাদনে অংশগ্রহণ করেছে। এর পরবর্তীকালে গ্রীস ও রোমান সভ্যতায় নারীর অর্থনৈতিক স্বীকৃতি দেখা যায় না। মধ্যযুগে নারীকে পুরুষের ভোগ লালসার বস্তু ছাড়া কিছুই ভাবা হত না। কিন্তু বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতা সবকিছুকে ওলট পালট করে দিয়েছে। তাই বিংশ শতাব্দীর নারীকে নেমে আসতে হয়েছে পুরুষের পাশাপাশি, কলে কারখানায়, অফিসে আদালতে। এই নেমে আসা একটা আকস্মিক উত্তেজনার ফলে হয়নি বরং সুষ্ঠুভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার তাগিদেই সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেক প্রগতিশীল রাষ্ট্রে উৎপাদনে মেয়েদের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।[৩]

নির্মাণ কাজে, পুলিশ বাহিনীতে, সাংবাদিক হিসেবে, এমনকি সামরিক বাহিনীতেও নারীর অংশগ্রহণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে ১৯৪৯-১৯৫৫ সময়কালে প্রকাশিত 'বেগম'-এর সম্পাদকীয়তে। আমাদের দেশের নারীসমাজ বিশেষত মধ্যবিত্ত নারীসমাজ যে জীবিকার প্রশ্নে সাংবাদিকতা পেশার কথা ভাবতে পারে, বিলেতের মেয়েদের সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের উল্লেখপূর্বক তা উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে–

আমাদের দেশেও জীবিকা অর্জনের প্রশ্ন মেয়েদের কাছে বিশেষত মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের কাছে ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সাংবাদিকতা মেয়েরাও অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। কেবলমাত্র কেরানীগিরি ও শিক্ষয়িত্রীর কাজের জন্য লোলুপ না হয়ে সাংবাদিক বৃত্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য শিক্ষিতা বোনদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের দেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা এখনো প্রয়োজনের অনুরূপ নয়। পাশ্চাত্য দেশগুলির সমকক্ষ হতে হলে আরো অনেক রকমের সাময়িক পত্রের প্রয়োজন। কাজেই সংবাদপত্রের সংখ্যা আমাদের দেশেও বেড়ে যেতে বাধ্য। তখন সাংবাদিকের বিরাট চাহিদাও উপস্থিত হবে। শিক্ষিতা বোনেরা যদি এই সম্মানজনক বৃত্তির জন্য ট্রেনিং গ্রহণ করতে থাকেন, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সংবাদপত্রের অফিসে চাকুরী পেতে পারেন।[৪]

সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণের জন্য তাগাদা দিয়ে আর একস্থানে বলা হয়—

আমাদের দেশের মেয়েরা আজ যদি সাংবাদিক জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম হতেন, তাহলে আমাদের গৌরব আরও শতগুণে বৃদ্ধি পেত সন্দেহ নাই। আজ যেমন করে তুরস্কের মহিলা সাংবাদিকরা আমাদের দেশের সম্পর্কে ঔৎসুক্য নিয়ে এদেশে শুভেচ্ছা সফরে এসেছেন, তেমনি করে এ-দেশের মহিলা সাংবাদিকরাও অন্য দেশ সফরের সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন এবং আমাদের দেশের ও নারীসমাজের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারাকে আপন গৌরবে বিদেশে পরিব্যপ্ত করতে সক্ষম হতেন। কিন্তু বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দেবার মত মেয়ের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। আজাদী লাভের পর আমাদের এ দুর্বলতা আরও প্রকট হয়ে ধরা পড়ছে— কাজেই বিদেশের দেখাদেখি এবং স্বদেশের মঙ্গলার্থে এ দেশের মেয়েদেরও এ বিষয়ে তৎপরতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে যাচ্ছে। আজ শিক্ষিতা সমাজের এই সবচেয়ে সম্মানজনক কাজের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা চলবে না। সমাজ ও জাতির অগ্রগতির পরিচয় বহন করে শিক্ষিতা মেয়েদের এ-বিষয়ে রীতিমতো সাড়া দিতে হবে।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিকতা পেশার পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীতেও মেয়েদের নিয়োগের আহ্বান জানানো হয়। তৎকালীন সমাজে আর্থিক উপার্জনের প্রশ্নেই মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণ সমালোচনার চোখে দেখা হলেও 'বেগম' সেই দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে সকল পেশার পাশাপাশি পুলিশ বাহিনীতেও মুসলিম নারীর অংশগ্রহণের পক্ষে মত ব্যক্ত করে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়—

> *পুলিশের কাজে মেয়েদের নিয়োগ এদেশবাসীর কানে নতুন ঠেকলেও পৃথিবীর অগ্রগামী অন্যান্য দেশে নারী কেবলমাত্র পুলিশের দায়িত্ব নয়— অবলীলাক্রমে যুদ্ধে পর্যন্ত আত্মনিয়োগ করেছে। সম্প্রতি চীনের কম্যুনিস্ট বাহিনীতে মেয়েরাও যুদ্ধ করছে। বর্মায় যুদ্ধেও কারেন নারী বর্মী সেনাদের সাথে যুদ্ধ করছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। কাজেই পুলিশের কাজে এদেশের মেয়েদের যোগ্যতায় সন্দেহ করার কোন কারণ দেখা যায় না। আর কেবলমাত্র যোগ্যতার দিক থেকে নয়, বিশেষ কারণবশত মহিলা পুলিশ নিয়োগের সার্থকতা আছে। নারী অপরাধীদের পুরুষ পুলিশ কর্মচারীদের হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার সময় কিছুটা লাঞ্ছনাভোগ এবং শ্লীলতার হানি ঘটার আশঙ্কা থাকে। এজন্য অপরাধিনীদের গ্রেপ্তারিতে অনেক সময় অযথা বিলম্বও ঘটে থাকে। এই সব দিক থেকে বিবেচনা করলে মহিলা পুলিশ কর্মচারী নিয়োগ বাঞ্ছনীয় ও সমীচীনই মনে হয়।*[৬]

শিক্ষিত নারীই শুধু নয়, অশিক্ষিত নারীও যেন কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে সচেষ্ট হয় সে-বিষয়ে 'বেগম' ছিল সোচ্চার। বিভিন্ন কারখানা, প্রতিষ্ঠান কিংবা গৃহনির্মাণ কাজে যেসব নারী শ্রমিক নিয়োজিত তাদের মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে—

> *এসব নারীশ্রমিক নারী হিসেবে কোন বিশেষ সুবিধাতো পায়ই না বরং তাদের শ্রমের মর্যাদাকেও যথাযথ স্বীকৃতি দিতে কর্তৃপক্ষ সম্মত নয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, প্রতিকূল পরিস্থিতি, অতিরিক্ত পরিশ্রম সর্বোপরি নিম্ন বেতন তাদের কর্মক্ষমতা হ্রাস করে বহুগুণে। একই কাজে পুরুষ সহকর্মীর সমান পরিশ্রম করেও এরা পারিশ্রমিক পায় অর্ধেক। কোন ছুটিও এরা পায় না।*[৭]

নারী শ্রমিকদের প্রতি এহেন সামাজিক অবিচারের প্রতিবাদে বলা হয়েছে—

> *নারী শ্রমিকদের কার্যাবস্থার উন্নতি, যুক্তিসংগত কার্যকাল নির্ধারণ, বিশ্রামের ব্যবস্থা, প্রসূতি ভাতা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, মজুরী বৃদ্ধি প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নিয়ে কোন আন্দোলনই আজ পর্যন্ত পাকিস্তানে হয় নাই। কিন্তু এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই সমস্ত শ্রমিক নারীসমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের ভালমন্দ, সুখ-দুঃখের সাথে নারীসমাজ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এইসব মানুষ সমাজের জঞ্জাল নয় বরং এরাই সমাজের গৌরব, এরা মেহনতী। এরা নিজেদের জীবিকা অর্জন করে— মানুষের পক্ষে যা সবচেয়ে গর্বের কথা। কাজেই নারী শ্রমিকদের প্রতি সমগ্র মহিলা সমাজের একটা মহান নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। যে সমস্ত মহিলা প্রতিষ্ঠান নারী কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।*[৮]

১৯৪৭-এ ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে যে শিশু রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল, সেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের অগ্রগতিতে নারীর ভূমিকা চিহ্নিত করার পাশাপাশি 'বেগম' পত্রিকাটি একটি সর্বজনীন দৃষ্টিকোণ থেকেও সমাজকে দেখার চেষ্টা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ শুধু নারীজাগরণ নয় কিংবা নারীর ভূমিকা চিহ্নিতকরণ নয় বরং সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ, সামাজিক উন্নয়ন এবং এর অবক্ষয় সবকিছুর প্রতিই 'বেগম' তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামত ফুটিয়ে তুলেছে। স্বাধীনতা লাভের পরপরই যে সমৃদ্ধ পাকিস্তানের স্বপ্ন বাঙালি মুসলমানরা দেখেছিল, সেই স্বপ্ন ভেঙে যেতে তাদের খুব বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। বরং জাতীয় পর্যায়ের আর্থিক বিপর্যয় সেই বাস্তবতা ত্বরান্বিত করেছিল অনেক দ্রুতলয়ে। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের ১০ম বার্ষিক রিপোর্টে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা ছিল রীতিমতো আশংকাজনক। স্টেট ব্যাংকের বিবরণ অনুযায়ী এই অর্থনৈতিক বিপর্যয় সম্পর্কে 'বেগম'-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়—

> *এই সঙ্কটের জন্য মূলতঃ দেশের ঘাটতি বাজেট ও সরকারের অত্যধিক ব্যয় বৃদ্ধিকে দায়ী করা হয়েছে। প্রথমতঃ ঘাটতি বাজেটের কথা ধরা যাক। ঘাটতি বাজেট যে দেশের জন্য অনিষ্টকর তা নয় বরং উদ্বৃত্ত বাজেটের তুলনায় অনেক সময় ঘাটতি বাজেট থেকেই উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের অগ্রগতি আশা করা যায়। কিন্তু স্টেট ব্যাংকের বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে অত্যধিক খরচ। কেবলমাত্র গত তিন বৎসরেই সরকারের এই বর্ধিত ব্যয়ভার বহনের জন্য স্টেট ব্যাংককে প্রায় দেড়শত কোটি টাকার অতিরিক্ত অর্থ বাজারে ছাড়তে হয়েছে। অথচ শোনা যায় এই অর্থ প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় খাতেই অধিক ব্যয় করা হয়েছে। সরকারী খাতে প্রতি বৎসর যে বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় হচ্ছে, বহু আগেই তা স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তথাপি বিষয়টি সম্পর্কে সরকারের কোনরূপ সচেতনতাবোধ জাগেনি। মন্ত্রী ও পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের ঘন ঘন বিদেশ যাত্রা এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ঢাকা-করাচী-লাহোর যাতায়াত পূর্বের ন্যায়ই অব্যাহত রয়েছে। বিদেশে আমাদের দূতাবাসসমূহে যে অর্থের অপচয় হচ্ছে তার পরিমাণও নেহায়েত কম না। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরে শিল্প, বাণিজ্য, চাকুরী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিদিন একটা মোটা অঙ্কের সরকারী অর্থ আত্মসাৎ হচ্ছে বলে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়। দেশব্যাপী এরূপ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় সরকারকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। অন্যথায় জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে ভাংগন সৃষ্টি হবে কোন অবস্থাতেই তাকে আর রোধ করা সম্ভব হবে না।*[৯]

বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক জীবনের একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ হলো দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রকৃত কারণ বা মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনে তার প্রভাব নির্ণয়ে বরাবরই 'বেগম' ছিল উদ্যোগী—

> *চাল, ডাল, নুন, তরকারী থেকে শুরু করে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার আবশ্যকীয় প্রায় সকল জিনিসপত্রই বর্তমানে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। কোন কোন জিনিস আবার মোটামুটিভাবে বাজার থেকে প্রায় অন্তর্হিত। বেশী পয়সা দিয়েও সেগুলো পাওয়ার উপায় নেই।*[১০]

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির এরূপ ঊর্ধ্বমূল্যের পেছনে যে একটি অসাধু চক্র, অতি মুনাফালোভী শ্রেণী কাজ করছে তা উদঘাটনেও 'বেগম'-এর দৃষ্টি ছিল প্রখর—

Dhaka University Institutional Repository

মিসরের যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রদেশের এক শ্রেণীর অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ী অস্বাভাবিক রূপে তৎপর হয়ে উঠেছে। ব্যবসায়ীসুলভ সততা ও সরকারী নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা ইতিপূর্বে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুদ রেখে প্রদেশে যে খাদ্যাভাব সৃষ্টি করেছে তার জের এখনো কাটে নাই। তার উপর সম্প্রতি আবার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর এদের দৃষ্টি পড়েছে। বাজারে প্রাপ্য প্রত্যেকটি জিনিসই বর্তমানে দ্বিগুণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনগুণ মূল্যে ক্রয় করতে হচ্ছে। ডাল, তরকারী, মাছ প্রভৃতি কাঁচামালের এরূপ অগ্নিমূল্যের সংগে সুয়েজ খালের যুদ্ধের কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর অতিমুনাফালোভী ব্যবসায়ীর গভীর ষড়যন্ত্রের ফলেই এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।[১১]

খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ যেকোন নাগরিক জীবনের জন্য জটিল সমস্যা। এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী সব ধরনের খাদ্যদ্রব্য এমনকি ওষুধপত্রে পর্যন্ত ভেজাল মিশিয়ে নিজেদের সাময়িক লাভের আশায় মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনশক্তি বিনষ্ট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। এই শ্রেণীর অসাধু অপতৎরতা রোধে নির্দিষ্ট আইন থাকা সত্ত্বেও তার যথাযথ প্রয়োগের অভাবে এরা পার পেয়ে যায়। শুভংকরের এই ফাঁকি ধরিয়ে দিয়েছে 'বেগম'—

এই শ্রেণীর সমাজবিরোধী লোকদের দমনের জন্য অবশ্য আইন আছে, বিধান আছে। কিন্তু সে আইন কিংবা বিধান যথার্থ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলেই কেবল এদের দমন করা সম্ভব হবে। অন্যথায় দেশের মানুষের তথা ভবিষ্যত বংশধরদের ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে দুর্বল ও দুর্বিষহ জীবন যাপন করতে হবে।[১২]

শুধু চাল, ডাল, নুন, তেলের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় এইসব দ্রব্যই নয়, শিক্ষার প্রধান উপকরণ কাগজের মূল্যও একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছিল। তবে কাগজের এই মূল্য বৃদ্ধির পেছনে অসাধু গোষ্ঠীর পাশাপাশি সরকারি নীতিও যে সমভাবে দায়ী 'বেগম' তা উদ্‌ঘাটনে ছিল আন্তরিক—

কাগজের এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির পেছনে সরকারী নীতিই দায়ী সে কথা আর কাউকেও বুঝিয়ে দিতে হবে না। বাজারে মওজুদ কাগজের আনুমানিক হিসাবের উপর ভিত্তি করে সরকার কাগজের নূন্যতম বিক্রয়মূল্য নির্দিষ্ট করে দিলেন, কিন্তু বিশিষ্ট বিক্রয় কেন্দ্রে কাগজ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেননি– দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন দোকানে বিক্রয়ের জন্য কাগজের সরবরাহও অব্যাহত রাখেননি। কেবলমাত্র পুলিশের উপর নির্দেশ দেওয়া হলো, যারা নির্ধারিত মূল্যের অধিক দরে কাগজ বিক্রয় করবে, তাদের গ্রেফতার করতে হবে। তাদের কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। এমন কঠোর নির্দেশ জারী করে সরকার হয়তো দেশবাসীর প্রতি তাদের কর্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ফল হয়েছে বিষময়। সরকারী নির্দেশ জারী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাতারাতি বাজারের সমস্ত কাগজ গুহাশ্রয়ী হলো। খোলা বাজারে কাগজের বিক্রয় একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। দেশের ছোটখাট ছাপাখানা, পুস্তক প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানগুলোকে হাত গুটিয়ে বসতে হলো। যে কাগজ এতদিন প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি হচ্ছিল তা সরকারী অদূরদর্শিতার ফলে দশগুণ চড়া দরে পিছনের দরজা দিয়ে বিক্রয় হতে শুরু হলো।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রীর পাশাপাশি যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি নগরবাসীর জন্য এক অতিরিক্ত চাপ। পূর্ব পাকিস্তানে এরূপ ভাড়া বৃদ্ধির উদ্যোগ যখনই নেয়া হয়েছে, 'বেগম' সচেতন থেকে তার ব্যাখ্যা চেয়েছে এবং পরিণতির প্রতি আলোকপাত করেছে। তদুপরি এরূপ ভাড়া বৃদ্ধির যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে—

> *রেল ব্যবস্থায় উন্নয়নের জন্য প্রদেশবাসী অতিরিক্ত মাশুলদানে কার্পণ্য করেনি। শুধু রেল উন্নয়ন নয়, দেশের যে কোন উন্নয়ন বা অগ্রগতিতে নানা করভারে জর্জরিত মানুষ নিজেদের দুঃখ কষ্ট অগ্রাহ্য করেও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত অর্থ যুগিয়েছে। অন্তত জনকল্যাণ রাষ্ট্রের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে তার যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান পূর্ব রেলওয়ের ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়টিকে জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত অর্থনৈতিক চাপ হিসেবেই গণ্য করা হচ্ছে। ভুক্তভোগীদের মতে, রেল কর্তৃপক্ষ উল্লেখিত ভাড়া বৃদ্ধির পূর্বে যাত্রী ও মাল বহনের যে মাশুল আদায় করেন, রেলওয়ের নানা অব্যবস্থা ও জনসাধারণের দুর্ভোগের দিক থেকে বিবেচনা করে তাকেই অতিরিক্ত মনে করা হতো। সুতরাং বর্তমানে তার উপর আরও শতকরা ১০ ভাগ মাশুল বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণকে অধিকতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে।*[১৪]

দ্রব্যাদির চড়া মূল্যের পথ ধরে এবং দুটি বন্যার পর এক সময় প্রদেশে খাদ্যভাব চরম আকার ধারণ করে। পরিস্থিতি এমন হয় যে, অনেক এলাকায় ধান চালের মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায় এবং বহুসংখ্যক মানুষকে একবেলা খেয়ে অথবা না খেয়ে দিন কাটাতে হয়। অনেক হতভাগ্যকেই আবার অনশনক্লিষ্ট অবস্থায় নিতান্ত করুণভাবে ক্ষুধাবর্জিত লোকে আশ্রয় নিতে হয়েছে। এহেন চরম পরিস্থিতিতেও অনশনে মৃত্যুবরণকে অনেকেই মূলত মানসিক আতঙ্কের ফল বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। জীবনের চরম দুর্দশাকে নিয়ে এরূপ হালকা মনোভাব পোষণকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে 'বেগম'—

> *নোয়াখালী থেকে অনশনে মৃত্যুর খবর নিয়ে সমালোচনা চলছে। পূর্ব পাকিস্তানের নানা এলাকা থেকে অহরহ গুরুতর খাদ্য পরিস্থিতি এবং অসম্ভব রকম মূল্যবৃদ্ধির খবর আসছে। ফরিদপুর থেকে অনশনে মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেছে। মানসিক আতঙ্কমাত্র বলে যাঁরা এই সমালোচনাকে উড়িয়ে দিতে চান তাঁরা পরিস্থিতির জটিলতা দূর করার জন্যে কী উপায় অবলম্বন করেছেন তা জানা যায় নি। কেবলমাত্র মানসিক আতঙ্কে মানুষ থালার ভাত ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করে এ-খবর কাদের তাঁরা বিশ্বাস করতে বলেন? কর্তৃপক্ষ কী বলতে চান মানুষের মধ্যে খেতে পেয়েও খেতে পাই না বলবার মত এবং তার প্রমাণ দেবার জন্য মৃত্যুবরণ করবার মত বিলাসিতা বিদ্যমান! মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ভার মনস্তাত্ত্বিকদের হাতে ন্যস্ত করে বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মোকাবেলা করবার সাহস অর্জন করলেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।*[১৫]

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং তার পরিণতিতে অনাহারে মৃত্যুবরণের পাশাপাশি আর একটি অনুষঙ্গে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ জড়িয়ে পড়ছিল— তা হল সামাজিক অবক্ষয়। মানুষের ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা, রাস্তাঘাটে নারীদের অবমাননা, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি নেতিবাচক কর্মকাণ্ড বেড়ে যাচ্ছিল—

Dhaka University Institutional Repository

'বেগম' সংজ্ঞায়িত করেছে সামাজিক কলঙ্ক হিসেবে। শুধু চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন এবং শিশু, বালিকা ও নারী অপহরণের অপরাধই নয়; একই সঙ্গে অবৈধ প্রণয়, পরস্ত্রী অপহরণ, অসামাজিক বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের উৎসবে এবং রমনা গ্রীন এলাকায় শিল্পমেলায় কতিপয় দুষ্ট ও গুণ্ডা শ্রেণীর লোক কর্তৃক নারীদের লাঞ্ছিত করার প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়—

> *মহিলারাও দেশের নাগরিক। সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় উৎসবাদিতে আনন্দ উপভোগ করার অধিকার পুরুষের যতটা রয়েছে নারীর তার চেয়ে কোন অংশে কম নেই। তদুপরি একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে উভয়েরই যোগদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু একটি জাতীয় উৎসবে গুণ্ডা কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া কিংবা কোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার কথা কেউ কল্পনা করেন নি। আমরা এই বর্বরতার যথাযথ নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।*[১৬]

ঘটনা পরম্পরায় দেখা যায়, এজাতীয় অপকর্মের সংগে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় সকলেই তথাকথিত শিক্ষিত। শিক্ষিত ব্যক্তিদের এরূপ হীন, বিকৃত মানসিকতার পেছনে যে মনস্তাত্ত্বিক কারণটি নিহিত সে সম্পর্কে বলা হয়—

> *প্রকৃতপক্ষে এক শ্রেণীর অমার্জিত ও রুচি বিকৃতি সম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তির তথাকথিত অতি প্রগতিশীলতাকেই এরূপ বিভিন্ন সামাজিক কলঙ্ক ও অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য দায়ী করা চলে। পাশ্চাত্য সামাজিকতার যা কিছু ক্ষতিকর বা অমংগলজনক, সস্তা রং, চং- এ আকৃষ্ট হয়ে এই শ্রেণীর লোকেরা কেবলমাত্র সেগুলোকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করে। শুধু তাই নয়, বিকারগ্রস্ত মনের তাড়নায় এই দুষ্ট ক্ষতকে এরা নানা দিক থেকে সমাজদেহে সংক্রামিত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠে।*[১৭]

সামাজিক অবক্ষয়ের আর একটি দিক 'বেগম' উদঘাটন করেছে— তা হলো পতিতাবৃত্তি। মানুষের স্বাভাবিক কতকগুলো জৈবিক তাগিদ রয়েছে, যাকে প্রয়োজন বলে আখ্যা দেওয়া চলে। এ তাগিদ নিবৃত্তির জন্যে মানুষ জীবনের সামগ্রিক পদ্ধতিতে অত্যন্ত ন্যায়বান ও বৈধ পথই খুঁজে ফেরে। অর্থাৎ এ প্রয়োজনগুলো মেটানোর সুস্থ পথ যদি কারো আয়ত্তে থাকে, তবে সে যে কোনও নীতিহীন বিকল্প পথকে ঘৃণা করবে। অপর পক্ষে উল্লেখযোগ্য যে, প্রয়োজন মেটানোটাই বড় কথা এবং এইটে যতক্ষণ না মিটছে, ততক্ষণ কোনও মানুষই বসে থাকতে পারে না বা দমিত হতে পারে না। বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি, ক্ষুধা, যৌন প্রবৃত্তি প্রভৃতি মানুষের আদিম প্রবণতা – মানুষের জীবনের গতি প্রকৃতি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় এ সবের উপরই। পতিতাবৃত্তি শেষোক্ত মানবিক প্রবৃত্তির সংগে সংশ্লিষ্ট। পতিতাবৃত্তি কেন সমর্থিত হয়? কেনই বা সমাজে পতিতাদের অস্তিত্ব আছে? কিংবা থাকাটা কি অপরিহার্য?— এ সকল প্রশ্নের সামাজিক বিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষ করা যায় 'বেগম'-এর ৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে, সেখানে বলা হয়—

> *এটা কী এমন কোন জৈবিক তাড়না যা কাকেও পতিতা হতে বাধ্য করে? যৌন প্রবৃত্তির এমন আকর্ষণ আছে কিনা যা এইদিকে স্বভাবতই আকর্ষণ করে? এই মূল সমস্যার উপর তথ্য সংগ্রহ*

Dhaka University Institutional Repository

এবং গবেষণা করে দেখা গেছে যে, পতিতাদের শতকরা ৯৮ জনই অর্থনৈতিক কারণে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করেছে। সামাজিক জীবনে বিপর্যয় কিংবা চারিত্রিক স্খলন কাউকে কোন অবশ্যম্ভাবী কার্যকারণের সম্মুখীন করে দেয়, সময় সময় যার ফলে জীবন ধারণের উপায় হিসেবে পতিতাবৃত্তি তাকে বেছে নিতে হয়। অবশ্য এ-কথাও এখানে লক্ষণীয় যে পতিতার নিকটও তার এই বৃত্তি মোটেই সমর্থিত হয় না, আর এই জীবিকা ধারণ পদ্ধতিকে সে নিজেও ঘৃণা করে। কিন্তু অনন্যোপায় হয়েই তাকে এ-অবস্থানটি মেনে নিতে হয়। পতিতাকে স্বাভাবিক জীবনের সুযোগ দেওয়ামাত্র তাকে এর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে দেখা গেছে এবং স্বাভাবিক জীবনেই তাকে জীবনের মুক্তি, আনন্দ ও তৃপ্তি পেতে লক্ষ্য করা গেছে। মানুষ মূলগতভাবে অপরাধপ্রবণ নয়। সে সকল সময়ে সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনই নিজের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। আমরা যে সমস্ত বিকৃত জীবনধারা কিংবা আচার দেখি তা আমাদের বিকৃত সমাজব্যবস্থার কারণেই ঘটে থাকে। অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজন মেটানোর স্বাভাবিক পথগুলো প্রায়ই অবরুদ্ধ থাকে। অনেককেই শেষপর্যন্ত বিকৃত পন্থার সাহায্য নিতে হয়। জীবনের স্বাভাবিক ধারায় যদি আমরা প্রত্যেকটি কাজ ও প্রয়োজন মেটাতে পারি তবে বিকৃতি ও নীতিহীনতার কোন প্রশ্রয়েরই সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের জীবনে তাই স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনধারা প্রবর্তিত হওয়া সম্ভব। পতিতাবৃত্তি স্বাভাবিক জীবন পদ্ধতি নয় এবং একে সম্পূর্ণভাবে দূর করা যায়। তবে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ প্রতিরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ মানস থেকে বিকৃতিকেও দূর করার প্রশ্ন উঠে। শুধু শুধু কতগুলো পতিতালয় বিনষ্ট করলেই চলবে না, সামাজিক বিকৃতিকে মূলগতভাবে বিনষ্ট করতে হবে।[১৮]

সামাজিক যে কোনও ইস্যুতেই 'বেগম' সবসময় সমর্থন করেছে মানবতাবাদকে— যেমনটি ঘটেছে পাকিস্তানে ভারত থেকে উদ্বাস্তুদের আগমনের ঘটনায়। এ আগমন ছিল কয়েক শত এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে কয়েক সহস্র হারে। এদের মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, যুবা, নর-নারীসকল পর্যায়ের মানুষ রয়েছে। উদ্বাস্তুরা বেশীরভাগই পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আসছে। 'বেগম' এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছে—

যে পরিবেশ এবং যে অবস্থার মধ্য দিয়ে এরা দিনাতিপাত করছে, তাকে মোটামুটিভাবে মানুষের উপযোগী বলা চলে না। বলা বাহুল্য এদের ভারত থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে। বিশেষ করে পাকিস্তানের বর্তমান উন্নয়ন প্রচেষ্টার একটা বড় রকমের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই সেখানকার সংখ্যালঘুদের জোর করে পাকিস্তানে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান যুগে এ-ধরনের ঘৃণ্যতম প্রচেষ্টাকে পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলের মানুষ নৈতিকতা বিরোধী বলেই বিবেচনা করবে। আর এক্ষেত্রে ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতার যে প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে তা দিনের আলোর মতোই সুস্পষ্ট বলা যায়। ভারতের এই দূরভিসন্ধি সত্ত্বেও নিরাশ্রয় উদ্বাস্তুদের আমরা গ্রহণ করবো। অন্তত মানবতার প্রশ্নে তাদের আমরা ফিরিয়ে দিতে পারি না।[১৯]

পরবর্তী সংখ্যাগুলোতেও উদ্বাস্তু সমস্যার উপর আলোকপাত করা হয়েছে এ-কারণেই যে, আর সব সামাজিক সমস্যার ন্যায় এ-সমস্যাটিও সমাধানহীন থেকে গেছে। বিশেষ করে উদ্বাস্তুদের প্রতি মানবতার যে দৃষ্টিভঙ্গি 'বেগম' আরোপ করেছিল, তাও জাতীয় পর্যায়ে অবহেলিত ছিল। বক্তৃতা বিবৃতিতে উদ্বাস্তু সমস্যার প্রসঙ্গ অসংখ্যবার উঠে এলেও বাস্তবে কোনও পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

আশ্রয় ও সামাজিকভাবে অন্ন সংস্থানের জন্য কোনও স্থায়ী ও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়নি।

যে কোনও জাতির বা সমাজের অগ্রগতিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে যে ক্ষেত্রটি তা হলো সে দেশের সংবাদপত্র। সার্বিকভাবে সামাজিক নানা বিষয়ে, রাজনৈতিক আচরণে, শিক্ষাক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক বিষয়ে সংবাদপত্রের প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু এই ভূমিকা পালনের জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যা আজ পর্যন্ত কোনও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানই নিরঙ্কুশভাবে ভোগ করতে পারেনি। কারণ যুগে যুগে রাষ্ট্রপক্ষ, ক্ষমতাসীনপক্ষ, প্রভাবশালী মহল নানা নিয়ম-কানুন, আইনের বাঁধনে রাখতে চেয়েছে সংবাদপত্রের অগ্রযাত্রাকে।[২০] নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র অর্জনে তৎকালীন মুসলিম সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা নেহাত কম ছিল না। কিন্তু তারপরও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও এতদঞ্চলের সংবাদপত্রগুলি তেমন প্রসার লাভ করতে পারে নি। এর জন্য মূলত সরকারকেই দায়ী করা হয়। কারণ কতিপয় সংবাদপত্রের উপর নিরাপত্তা আইন জারীর মধ্য দিয়ে মূলত সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করেছে। যেমন সাংবাদিক-সাহিত্যিক জেবুন্নিসা হামিদুল্লা সম্পাদিত করাচীর প্রভাবশালী ইংরেজি মাসিক পত্রিকা 'মীরর'-এর উপর ছয় মাসের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। 'মীরর'-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, জনাব সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগ প্রসঙ্গে পত্রিকার সম্পাদকীয়তে প্রেসিডেন্ট জনাব মীর্জাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয় এবং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানকে অগণতান্ত্রিক বলে উল্লেখ করা হয়। সংবাদপত্রের প্রতি তৎকালীন শাসকবর্গের এহেন আচরণ প্রসংগে 'বেগম'-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়—

> *সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মীররের এই মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কি অন্যায় হয়েছে, আমরা সে প্রশ্নে কোনরূপ বিতর্কের অবতারণা করছি না। তবে সাধারণভাবে একথা আমরা বলতে পারি যে, নিরাপত্তা আইনে সংবাদপত্রের উপর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর সরাসরি হস্তক্ষেপেরই সামিল। প্রকৃতপক্ষে, সংবাদপত্র দ্বারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হলে কিম্বা ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে আইনানুগভাবে যথারীতি আদালতের দ্বারস্থ হওয়াই সমীচীন। তজ্জন্য নিরপত্তা আইনের অজুহাত সৃষ্টি করা অথবা বিকল্প উপায়ে কণ্ঠরোধ করার কোন আবশ্যকতা আছে বলে মনে হয় না।*[২১]

১৯৪৭ সালে তথাকথিত স্বাধীনতা অর্জনের পর পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশই অর্থ, বিত্ত, সুযোগ, সুবিধায় যেরূপ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে বলে ধারণা করা হয়েছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে এই ধারণা পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হলেও, পূর্ব পাকিস্তান পুরোটাই থেকে গিয়েছিল বঞ্চিতের তালিকায়। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের পাকিস্তান রাষ্ট্র সমর্থনের প্রধানতম কারণ ছিল তাদের অবস্থার উন্নতি। অভিন্ন ভারতবর্ষে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বিদ্যমান ছিল। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে শুরু করে পেয়াদা-চাপরাশির পদ পর্যন্ত হিন্দুরা দখল করে আছে বলে, মুসলমানরা মনে মনে এক

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের ক্ষোভ পোষণ করত।[২২] এই বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতেই মুসলমানরা পাকিস্তান সমর্থন করেছিল। তারা ভেবেছিল পাকিস্তান এমন একটা দেশ হবে, যে দেশের জনগণ সব রকমের অন্যায় অবিচার এবং শোষণ থেকে মুক্ত থাকবে। ব্যক্তিস্বার্থ, লালসা ও দারিদ্র্যের আশঙ্কা থাকবে না। স্বপ্নের পাকিস্তানে দরিদ্রের সন্তানও নিজের মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে শিক্ষা লাভের ও বড় হবার সবরকম সুযোগ পাবে। এই দেশে দারিদ্র্য ও অশিক্ষা থাকবে না, একটি মানুষও অভুক্ত রাত্রি যাপন করবে না।[২৩] কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পাঁচ থেকে দশ বছরের মাথাতেই পাকিস্তানের পূর্ব প্রদেশের জনগণের এই স্বপ্ন ভেঙে যায়। এই স্বল্প সময়েই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি শ্রেণীর জনগণই চরম দুর্ভোগ ও বৈষম্যের শিকার হয়।

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যে কোনও জাতিগঠনেই শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। আর একাজে নিয়োজিত শিক্ষকরা এই সময়কালে পতিত হয়েছেন চরম দুর্দশায়। যে সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে এরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন 'বেগম' তারই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছে—

> *পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত যোগ্য প্রাথমিক শিক্ষকের সর্বসাকুল্যে বেতন হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা। এই টাকায় অগ্নিমূল্যের বাজার থেকে চাল, ডাল, লবণ, তেল প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় থেকে আরম্ভ করে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা, ঔষধ পথ্যের খরচ সমস্ত ব্যয়ই নির্বাহ করতে হয়। ফলে বৎসরের বার মাসই এদের ঘরে অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-কষ্ট লেগে থাকে। শিক্ষকদের এই স্বল্প বেতনও আবার নিয়মিতভাবে দেওয়া হয় না, বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষের দিনেও অনেক সময় তিন চার মাসের বেতন বাকী পড়ে থাকে।*[২৪]

রাষ্ট্রের সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত থাকায় সাধারণ মানুষ তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। সম্পদের সুষম বণ্টন না হওয়ায় জাতীয় অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানার ভিত্তি নির্দিষ্ট একটি গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে সাধারণ মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বঞ্চনার এই ঘেরাটোপ থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্ত করা এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে 'বেগম'—

> *পাকিস্তানের সমুদয় সম্পদ যে ২২টি পরিবারে কুক্ষিগত তা কে না জানেন? বিগত কয়েক বছরের অর্থনীতির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দেশীয় অর্থ কেবল একাঙ্গুল গ্রাহ্য বৃহৎ পুঁজিপতির তহবিলকেই স্ফীততর করেছে। দেশের শিল্প প্রয়াস যদি মুষ্টিমেয় পুঁজি মালিকের আওতায় আবর্তিত হয় তবে শিল্প প্রতিষ্ঠান সারা দেশে সম্প্রসারিত হতে পারে না। বড় পুঁজির মালিক যাঁরা তাঁদের আবার গ্রুপ-ইন্ডাষ্ট্রির উদ্যোগ গ্রহণের প্রতি দুর্বলতা রয়েছে। একই জায়গায় একই কর্তৃত্বে সর্ববিধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পত্তন হওয়ায় স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত অঞ্চলে শিল্পায়নের আদৌ বিকাশ ঘটে না।*
>
> *জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি সর্বদাই কাম্য। কিন্তু উৎপাদিত সম্পদের সুষম বণ্টন যদি না হয় তবে সে সম্পদ জাতীয় অগ্রগতির এক প্রবল অন্তরায় হয়েই দাঁড়ায়। দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে যেখানে সাধারণ মানুষের ভূমিকাই বড়, সেখানে স্বল্প সংখ্যক পুঁজিপতির অঙ্গুলী হেলনে সমস্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণ মানুষের অবস্থা তখন হয়ে দাঁড়ায় অনেকটা যন্ত্রের মত। অতএব*

Dhaka University Institutional Repository

> *সঙ্গতভাবেই তাদের মনে প্রথমে হতাশা, অতঃপর ক্রোধ এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ দানা বেঁধে ওঠে। এ-ব্যাপারে আমাদের শেষ কথাটি হচ্ছে এই যে, জাতীয় উন্নয়নের খাতিরেই এ-দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানার ভিত্তি সম্প্রসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।*[২৫]

এরূপ অসংখ্য বঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ এবং লাভ-লোকসানের খতিয়ান খুঁজতে বসে পূর্ববাংলার জনগণ। তারা কী পেয়েছে, কী পায়নি, কতখানি পাবার কথা ছিল তা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করে। স্বাধীনতা দিবসের বর্ষপূর্তিতে 'বেগম'ও এই খতিয়ান তুলে ধরে—

> *এককালের পাখী ডাকা ছায়া ঘেরা গ্রামগুলোর দিকে চোখ মেলে চাইলেই দেখতে পাই, ছয় বছরের আজাদী আমাদের যা দিয়েছে, নিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী। আমাদের গোলার ধান, আমাদের মুখের ভাষা, আমাদের পরিধানের বস্ত্র, এমনকি মায়ের বুকের দুধটুকু পর্যন্ত হারিয়ে গেছে। আমাদের পাটের ক্ষেতে রক্তলোভী হায়েনার হানা। পাট চাষীর মনে আজ গান নেই— চাষী বৌয়ের হাতের বাজুবন্ধ পর্যন্ত মহাজনের ঘরে বাঁধা পড়েছে। পরগৃহে নির্বাসিতা কন্যাকে বিরহী পিতা আজ আর নাইওর নিতে সাহস করেন না। চাকুরীর অভাবে সংসারের একমাত্র শিক্ষিত ছেলেটি আজ পথে পথে ঘুরে মরে। এক কথায় আজাদী লাভের পর, আজ এত বছর পার হয়ে আমরা দেখছি আমাদের পেটের অন্ন নাই, মা বোনের মুখের হাসি নাই, বেঁচে থাকার মতো বৃত্তি নাই, ভবিষ্যতের আশা নাই, আজাদ জীবনের স্বস্তিও নাই।*[২৬]

'বেগম'-এর ২৩শ বর্ষ ৫০শ সংখ্যা, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ সংখ্যাটি 'মহাপ্রলয়– ১৯৭০' নামে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর পূর্ববাংলার উপকূলীয় অঞ্চলে (নোয়াখালী, বাখরগঞ্জ, পটুয়াখালী, সন্দ্বীপ, খুলনা) প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ হারায় লক্ষ লক্ষ মানুষ। এই সংখ্যাটির সম্পাদকীয়, আলোকচিত্র, আলোচনা এবং নিরীক্ষাধর্মী লেখা— সবকিছুই আবর্তিত হয়েছে প্রলয়ঙ্কর এই দুর্যোগের ঘটনাকে ঘিরে। সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত হয়েছে— দুর্যোগে প্রাণ হারানো হতভাগ্যদের জন্য হাহাকার—

> *বিশ ফুট উঁচু হয়ে জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়লো পটুয়াখালী, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, ভোলা আর চর জব্বারের মতো শত শত উপকূলবর্তী জনপদে। দিশেহারা মানুষ আত্মরক্ষার সামান্য সময়টুকুও পেল না। কেউ প্রচণ্ড ঢেউয়ের টানে সমুদ্রের গর্ভে চলে গেল, কেউ চাপা পড়ল অগভীর পানির নীচে। দেখতে দেখতে রেনু রেনু হয়ে উড়ে গেল লক্ষ লক্ষ বাড়ীঘর, গাছগাছালি আর ক্ষেতের ফসল। অবিস্মরণীয় সেই ঘটনা, অকল্পনীয় সেই দৃশ্য! প্রকৃতির কি নিদারুণ সেই ক্রোধ। যোজন জোড়া বিধ্বস্ত প্রান্তর। গাছপালা, বাড়ীঘর এ-সব জায়গায় কোনোদিন ছিল বলে মনেই হয় না। মাঠের ওপর, নদীর ধারে, এখানে ওখানে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ গলিত মানুষ আর গবাদি পশুর দুর্গন্ধময় লাশ। সৌভাগ্যক্রমে যারা বেঁচে আছে, তাদের সবাই আজ আহত, ক্ষুধার্ত, সর্বহারা। এমনকি এক ফোঁটা পানির অভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে অগণিত আদম সন্তান।*[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

আবার দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও ব্যর্থতার জন্য ধিক্কার জানাতেও কুণ্ঠা বোধ করেনি 'বেগম'—

> *অত্যন্ত লজ্জা ও পরিতাপের কথা এই যে, এমন অকল্পনীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর প্রথম আমরা পেয়েছি সুদূর মহাদেশ অষ্ট্রেলিয়ার বেতার থেকে। আমাদের অচল নিষ্ক্রিয় আবহাওয়া বিভাগ এত বড় ঝড়ের প্রয়োজনীয় পূর্বাভাসটুকুও দিতে পারেনি। তাছাড়া ধ্বংসলীলার একদিন কেটে যাবার পর প্রদেশের বেতার সংবাদে মৃতের সংখ্যা ১৩ এবং আহতের সংখ্যা ৬৮ বলে প্রচার করা হয়। কিন্তু বিবিসি'র সংবাদ যখন সমগ্র বিশ্বের দুয়ারে ইথারে ছড়িয়ে পড়লো, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ চমকে উঠলো। বিবিসি'র খবর সূত্রে এদেশের মানুষ শুনতে পেল তাদের জীবনের সবচাইতে ভয়ঙ্কর দুঃখের সংবাদ। তারা শুনলো, মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বহু লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছে। ঐসব এলাকায় কোন গবাদি পশু বেঁচে নেই। চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না একটি গৃহ কিংবা ফসল ভরা একটিও ক্ষেত খামারের। কী দুর্ভাগা আমরা, দুর্যোগের বহু পরে আমাদের এ-কথা শুনতে হলো যে, পূর্ব বাংলার উপকূল অঞ্চলের দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে।*[২৮]

কেন্দ্রীয় নেতাদেরও 'বেগম' করেছে শরবিদ্ধ—

> *অগণিত লাশের সৎকার এবং জীবিতদের উদ্ধারের ব্যাপারে প্রাদেশিক রাজধানীতে তৎপরতার কোন চিহ্ন সাতদিনের মধ্যে দেখা যায় নি। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর পটভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রাদেশিক রাজধানীতে চলছে তুমুল নির্বাচনী কোলাহল। যেন, কিছুই হয় নি। এত বড় দুর্ঘটনায়ও দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা, দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কোথায় দিন যাপন করলেন? কেন কেবল মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব আর ওয়ালী খান ব্যতিরিকে অন্য কোনো নেতাকে দুর্গত এলাকায় ছুটে যেতে দেখা গেল না? প্রাদেশিক গভর্ণর কেন্দ্রের কাছে হেলিকপ্টার চেয়ে পান না কেন; কেন ঢাকায় বিদেশের ১৫৬ জন সাংবাদিক এলেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মাত্র একজন আসেন। এ-ধরনের অসংখ্য প্রশ্নে আমরা আজ ভারাক্রান্ত।*[২৯]

প্রকৃত প্রস্তাবে নারীর কর্মক্ষেত্রের সমস্যা, নারী নিপীড়ন কিংবা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, চোরাচালান, সরকারি ব্যয়-বাহুল্য, শিল্পক্ষেত্রে বৈষম্য ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অসমতা আরো দীর্ঘকাল টিকে ছিল এবং বলা যায় পশ্চিম পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতালাভ করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়েও এসব সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হয়নি। তথাপি সমাজের দর্পণ কিংবা প্রহরী (watch dog) যে ভূমিকাতেই থাকুক না কেন সংবাদপত্রের দায়িত্ব সমাজের এই বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো, অবস্থাগুলোর প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা। সংবাদক্ষেত্রের অংশ হিসেবে সাপ্তাহিক 'বেগম' সেই সামাজিক দায়িত্বটিই পালন করতে সচেষ্ট ছিল এবং সফলও হয়েছে। সম্পাদকীয় নিবন্ধ সামাজিক এই ক্ষেত্রগুলোর উপস্থাপন এবং সে-সম্পর্কে মতামত প্রকাশের মধ্য দিয়ে 'বেগম' একটি বিশেষ জনমত তৈরিতেও ভূমিকা রেখেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসংকেত

১. *সাপ্তাহিক বেগম, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮, পৃ. ৩*
২. *মেয়েদের স্বাধীন জীবিকার প্রশ্ন, সাপ্তাহিক বেগম, ২য় বর্ষ ২২শ সংখ্যা, ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯, পৃ. ৩*
৩. *মেয়েদের অর্থনৈতিক জীবন, সাপ্তাহিক বেগম, ৪র্থ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ৩রা জুন, ১৯৫১, পৃ. ৩*
৪. *সাংবাদিক বৃত্তি ও নারী, সাপ্তাহিক বেগম, ৩য় বর্ষ ১৩শ সংখ্যা, ২০শে নভেম্বর, ১৯৪৯, পৃ. ৩*
৫. *সাংবাদিকতা, সাপ্তাহিক বেগম, ৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১*
৬. *পুলিশ বাহিনীতে নারী নিয়োগ, সাপ্তাহিক বেগম, ২য় বর্ষ ২২শ সংখ্যা, ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯, পৃ. ৩*
৭. *নারী শ্রমিক, সাপ্তাহিক বেগম, ৬ষ্ঠ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ১৯শে জুন, ১৯৫৫, পৃ. ৩*
৮. *প্রাগুক্ত।*
৯. *আমাদের বিপর্যস্ত অর্থনীতি, সাপ্তাহিক বেগম, ১১শ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮*
১০. *দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সাপ্তাহিক বেগম, ১৫শ বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ১৪ই অক্টোবর, ১৯৬২*
১১. *নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য রোধ করুন, সাপ্তাহিক বেগম, ৯ম বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৫৬, পৃ. ৩*
১২. *খাদ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করুন, সাপ্তাহিক বেগম, ১৭ বর্ষ ১৩শ সংখ্যা, ২৯শে মার্চ, ১৯৬৪*
১৩. *কাগজের দুর্ভিক্ষ, সাপ্তাহিক বেগম, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩, পৃ. ৩*
১৪. *সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক বেগম , ১৭শ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা, ১০ই মে, ১৯৬৪, পৃ. ৩*
১৫. *পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্য পরিস্থিতি, সাপ্তাহিক বেগম, ২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮, পৃ. ৩*
১৬. *গুণ্ডা দমন করুন, সাপ্তাহিক বেগম, ১০ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ৭ই এপ্রিল, ১৯৫৭, পৃ. ৩*
১৭. *সামাজিক কলঙ্ক, সাপ্তাহিক বেগম, ১০ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা, ১৯শে মে, ১৯৫৭, পৃ. ৩*
১৮. *পতিতা উদ্ধার, সাপ্তাহিক বেগম, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ সংখ্যা, ১০ই মে, ১৯৫৩, পৃ. ৩*
১৯. *সাপ্তাহিক বেগম, ১৭শ বর্ষ ১৩ শ সংখ্যা, ২২শে মার্চ, ১৯৬৪, পৃ. ৩*
২০. *আহমেদ ফারুক হাসান, বাংলাদেশের গণমাধ্যম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১০*
২১. *মীরর-এর উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা, সাপ্তাহিক বেগম, ১০ম বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৫৭, পৃ. ৩*
২২. *ভুঁইয়া ইকবাল, বাংলাদেশের উপন্যাসে সমাজচিত্র (১৯৪৭-৭১), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৮*
২৩. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০*
২৪. *প্রাথমিক শিক্ষকদের দুঃখ দুর্দশা, সাপ্তাহিক বেগম, ৯ম বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭*
২৫. *সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক বেগম, ২৩শ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা ৮ই মার্চ, ১৯৭০*
২৬. *এই আজাদী, সাপ্তাহিক বেগম, ৬ষ্ঠ বর্ষ ২১ শ সংখ্যা, ৯ই আগস্ট, ১৯৫৩, পৃ. ৩*
২৭. *সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক বেগম, ২৩শ বর্ষ ৫০শ সংখ্যা, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭০*
২৮. *সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক বেগম, ২৩শ বর্ষ ৫০শ সংখ্যা, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭০*
২৯. *সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক বেগম, ২৩শ বর্ষ ৫০শ সংখ্যা, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭০*

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

‘বেগম’ পত্রিকার সম্পাদকীয় : সংস্কৃতিচিন্তা

সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ কী? সংস্কৃতির স্বরূপ উপলব্ধির সহজ উপায় হিসেবে বদরুদ্দীন উমর তাঁর ‘সংস্কৃতির সংকট’ গ্রন্থে কিছু পথ বাত্‌লে দিয়েছেন— সংস্কৃতির অভিব্যক্তি বলতে আমরা যা কিছু বুঝি সেগুলির প্রতি লক্ষ্যপাত করা। যেমন আচার-ব্যবহার, জীবিকার উপায়, সঙ্গীত-নৃত্য, সাহিত্য-নাট্যশালা, সামাজিক সম্পর্ক, ধর্মীয় রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি।[১] পুরো বিষয়টি যেমন একদিকে ব্যক্তির নিত্যকার জীবন-যাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত তেমনি জীবন উপভোগের ব্যবস্থা এবং উপকরণের সাথেও তা জড়িত। সংস্কৃতি বলতে এজন্যে কোনও জাতির বা গোষ্ঠীর সামগ্রিক আর্থিক জীবন থেকে শুরু করে ললিতকলা এবং শিষ্টাচার পর্যন্ত সবকিছুকেই বোঝায়।[২] অর্থাৎ সেই দেশ এবং জাতির অন্তর্গত মানুষদের জীবন-যাপন এবং জীবন-উপভোগের যাবতীয় পদ্ধতি এবং আয়োজনই এর অন্তর্গত। কাজেই কোনও জাতির ভাষা, শিক্ষা, রুচি, অভ্যাস, সংঘবদ্ধ হবার প্রবণতা ইত্যাদি সবই তার সাংস্কৃতিক চরিত্রের অন্তর্গত।

শিক্ষা সাধারণত যে কোনও ধরনের নিয়ম মাফিক প্রতিষ্ঠানগত বিদ্যার্জনকে আখ্যায়িত করে। কিন্তু এই আখ্যায়নের পরিধি ব্যাপক এবং সময় ও পরিস্থিতি ভেদে তা ভিন্ন অর্থ বহন করে। যেমন আঠার শতকে শিক্ষার অর্থ ছিল শাস্ত্রীয় জ্ঞান, লেখা ও পড়ার সক্ষমতা বা বড়জোর হিসাব রাখার বা কবিতা লেখার বা ইতিহাস লেখার ক্ষমতা। তবে কবিতা লেখা বা ইতিহাস লেখার ক্ষমতা সীমিত ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হতো। সাধারণ জ্ঞানার্জনের বাইরে সাহিত্য বা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন নারীদের রয়েছে বলে মনে করা হতো না।[৩] উনিশ শতকে সুরুচি ও সংস্কার মুক্ত জ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষা যুক্ত হলো এবং এর ব্যাপকতা সামাজিক উন্নতির পরিচায়ক বলে বিবেচিত হলো। বিশ শতকে কর্মসংস্থানের অবশ্য পূরণীয় শর্ত হিসেবে শিক্ষার নতুন অর্থ দেখা দিল এবং মানুষের অধিকারের অঙ্গরূপে গণ্য হলো।[৪]

সাপ্তাহিক ‘বেগম’ পত্রিকাটি সমাজে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতার প্রকাশ ঘটিয়েছে সব সময়ই। ‘বেগম’-এর সম্পাদকীয়ের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য, শিক্ষার গলদ সংক্রান্ত নানাবিধ মন্তব্য ও অভিমত। নারীশিক্ষা সম্পর্কে এতে বলা হয়—

> *একটি বালককে শিক্ষাদান করলে শুধু একটি ব্যক্তিকেই শিক্ষাদান করা হয় কিন্তু একজন বালিকাকে শিক্ষাদান করলে একটি পরিবারকে শিক্ষা দেয়া হয়।*[৫]

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে নারীকে কল্যাণকামী, সেবিকার ভূমিকায় দেখতে চেয়েছে 'বেগম'। কিন্তু এই সামাজিক ভূমিকা পালন করতে হলেও শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়—

> *অসংখ্য বাধা বিঘ্ন তাদের এই সেবার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। অশিক্ষা তন্মধ্যে একটি মারাত্মক বাধা। এই বাধার আশু অবসান ঘটাতে হবে। শিক্ষার আলোকপাত ও আর্থিক ব্যাপারে স্বাবলম্বী নারীই আমাদের সমাজকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবে।*[৬]

ভারতবর্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান পুরুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন হলেও নারীশিক্ষা প্রশ্নে বাঙালি মুসলমান সমাজে তখনও রক্ষণশীলদের প্রভাবই প্রাধান্য লাভ করছিল। মেয়েদের জন্য কোনও স্কুল ছিল না, তাছাড়া সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের জন্য অধিকাংশ ভারতীয় তাদের মেয়েদের শিক্ষাদানে আগ্রহী ছিলেন না।[৭] এ প্রসঙ্গে 'বেগম'-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়—

> *শিক্ষাক্ষেত্রে নারীসম্প্রদায়কে অতিমাত্রায় কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। মহিলাদের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয়ের অভাব, পর্দা পুশিদার সঙ্গে তাদের স্কুল কলেজে যাওয়ার ব্যবস্থার অভাব, সাংসারিক অর্থসংকট, সামাজিক কটাক্ষ ইঙ্গিত এবং সর্বোপরি সরকারী শৈথিল্য আজ পাকিস্তানী নারী শিক্ষাজীবনকে পানাপুকুরের ন্যায় বায়ু নিরুদ্ধ করে রেখেছে। যে জীবন নবীন সূর্যালোকে আত্মসুষমায় শতদলের ন্যায় বিকশিত হয়ে উঠতে পারতো তার চোখের সামনে আঁধারের কালো যবনিকা টেনে দেওয়া হয়েছে।*[৮]

৭ম বর্ষ ৪০শ সংখ্যায় সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনা করে বলা হয়েছে—

> *আমাদের দেশে সরকারের সংকুচিত শিক্ষা ও শিল্পনীতির ফলে নারীসমাজের মধ্যে শিক্ষা ও শিল্পের প্রসার প্রতিরুদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে দেশবিভাগের পর দীর্ঘ আট বছরে পূর্ববংগের মহিলারা এ-ব্যাপারে তেমন অগ্রসর হতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। মহিলাদিগকে বৃত্তিজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকারী তৎপরতা যেমন একেবারেই নাই, মহিলাদের পক্ষ থেকেও বেসরকারীভাবে তেমন উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালানো হয় নাই। ফলে এই স্বাধীনতার যুগে যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তাদের বিপুল নারীশক্তিকে কল্যাণমূলক কাজে লাগানোর জন্য তৎপর রয়েছে তখন আমরা কেবলমাত্র নারীদের রান্নাঘরের সমস্যা সমাধানের চিন্তা নিয়েই ব্যাপৃত রয়েছি— দেশের নারীসমাজের পক্ষে এ-যেমন লজ্জাজনক তেমনিই অকল্যাণকর।*

পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে, শিক্ষার কাঠামোকে জাতির প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে তোলা হবে— এই আশা দেশের সকল শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিই করেছিল। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত কোনও পরিবর্তন না আসায় এক ধরনের হতাশা নেমে আসে। এ সম্পর্কে বলা হয়—

> *শিক্ষা হচ্ছে জাতীয় উন্নতির মূল বুনিয়াদ অথচ এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে তেমন কোন গুরুত্ব না দিয়েই আমরা জাতীয় উন্নতির স্বপ্ন দেখছি। এটা ঠিক ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেওয়ার মতো*

Dhaka University Institutional Repository

> *ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশে শাসনযন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও শোষণকার্য নিখুঁতভাবে চালানোর জন্য ইংরেজ সরকারের প্রয়োজন ছিল একদল কেরানীর। এই কেরানী তৈরীকেই মূল উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। কাজেই উক্ত শিক্ষাব্যবস্থায় কোনরকমে শিক্ষিতের হার বাড়িয়ে দক্ষ কেরানী হওয়া চলে, জীবন সংগ্রামে দীনভাবে টিকে থাকার একটা উপায়ও করা চলে কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, উক্ত শিক্ষায় স্বাধীন দেশের মানুষ হওয়া চলে না।*[৯]

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা পরিস্থিতির নাজুক অবস্থা তুলে ধরা হয় 'বেগম' পত্রিকায়। রাষ্ট্রগঠনের প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে শিক্ষাকে সর্বাগ্রে স্থান দিলেও কাল পরিক্রমায় দেখা যায় এই স্থান কাগজে কলমেই থেকে গেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে তার যথাযথ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, নারীশিক্ষা ইত্যাকার অসংখ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ কাগজের ফাইলে বন্দী জীবন কাটিয়েছে, আলোর মুখ দেখেনি। স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে আশানুরূপ কোনও অগ্রগতি সাধিত হতে হয়নি। তাই 'বেগম'-এর আক্ষেপ—

> *স্বাধীনতা লাভের পর গত ১৭ বছর আমরা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক থেকে উল্লেখযোগ্য রূপে এগিয়ে এসেছি। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের দৈন্য ঘুচেনি এবং জীবনের এই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমরা দুঃখজনক অবস্থায় অনেক বেশী পিছিয়ে আছি। গত সুদীর্ঘ ১৭ বছরেও আমরা সাধারণ শিক্ষিতের শতকরা ২০ জনের বেশী অতিক্রম করতে পারিনি।*[১০]

শিক্ষার অগ্রগতির প্রতি সরকারি পর্যায়ের মনোযোগের অভাব এবং শিক্ষাখাতকে একটি গুরুত্বহীন খাত হিসেবে বিবেচনা করার মানসিকতারও সমালোচনা করা হয়েছে । এতে বলা হয়—

> *আমাদের এখানে সরকার বাজেটের শতকরা মাত্র ২ ভাগ ব্যয় করে শিক্ষাখাতে। পূর্ব পাকিস্তানে ১৫০০ শত মাধ্যমিক স্কুল আছে এর মাঝে মাত্র ৩৫টি সরকারী। বাকী ১৪৬৫টি বেসরকারী স্কুল। এই বেসরকারী স্কুলগুলোর অবস্থা কত যে হীনতায় পৌঁছেছে তা বলে শেষ করা যায় না। তারপর আবার সরকারী স্কুলে ৪০ ভাগ ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বেতন বৃদ্ধির ফলে আমাদের এই অর্থনৈতিক অসংগতির দিনে শিক্ষার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমে যাবে।*[১১]

বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় প্রাথমিক শিক্ষার দৈন্যদশার। অথচ যে কোনও জাতির শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে দেয় প্রাথমিক শিক্ষা। এ প্রসঙ্গে বলা হয়—

> *শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাপক দৈন্যের কথা কারো অজানা নেই। তন্মধ্যে সবচেয়ে দুঃখজনক অবস্থা প্রাথমিক শিক্ষার। যদি বলা যেতে পারতো, শিক্ষার প্রয়োজন নেই, তাহলে সম্ভবত এই অবস্থার উদ্ভব হতো না। কিন্তু যেহেতু আমরা নিজেদের স্বার্থেই জনকল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করতে চলেছি এবং সমাজে আমাদের অল্পবিস্তরভাবে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হবে, সেহেতু শিক্ষার আবশ্যকতাকে স্বীকার করতেই হবে। আর এই শিক্ষার বুনিয়াদ হলো প্রাথমিক শিক্ষা।*[১২]

Dhaka University Institutional Repository

শুধু শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করাই যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি এ বিষয়ে নজর দেওয়াও জরুরী যে, কী ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন হতে যাচ্ছে। বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষা মানবজীবনের জন্য কোনও অর্থই বহন করে না। 'বেগম'-এ বিষয়ে মন্তব্য করে—

> *শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এও ভেবে দেখা দরকার, কোন্ শ্রেণীর শিক্ষা আমাদের জন্য উপযোগী। আমলাতান্ত্রিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষার যে রীতি এতদিন আমাদের দেশে বহাল ছিল তার পরিবর্তন ক্রমশ অবশ্যই হবে। কিন্তু নারীর শিক্ষার বেলায় কেবল সেই পরিবর্তনটুকুই যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীদেরও যেমন নিজেদের উপযোগী শিক্ষা বাছাই করা প্রয়োজন, তেমনি শিক্ষা বিভাগেরও উচিত মেয়েদের উপযোগী বিশেষ বিশেষ বিভাগের জন্য আলাদা বিভাগের প্রবর্তন করা। যেমন নার্সিং বা নার্সারী ট্রেনিং প্রভৃতি। আবার সাধারণ বিষয়গুলোর মধ্যেও চিকিৎসাবিদ্যা, শিক্ষা বিষয়ক ট্রেনিং প্রভৃতি মেয়েদের জন্য অপেক্ষাকৃত উপযোগী।*[১৩]

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে স্কুল পাঠ্যসূচির ভিন্নতায় উদ্বেগ লক্ষ করা গেছে সাপ্তাহিক 'বেগম'– এ। তবে শুধু দুটো প্রদেশেই নয়, একই প্রদেশের বিভিন্ন শহরে এমনকি একই শহরের বিভিন্ন স্কুলেও পাঠ্যসূচির ভিন্নতা লক্ষ করেছে 'বেগম'। উভয় প্রদেশের ছাত্রদের অন্য প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। স্কুল পর্যায়েও একই অবস্থা বিদ্যমান থাকায় কলেজ পর্যায়েও ছাত্রদের মিলিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। এর ফলে এক প্রদেশের ছাত্রদের অন্য প্রদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশে একটা পরোক্ষ বাধার সৃষ্টি হয়। ফলে ছাত্রের তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সীমিত হয়ে পড়ে। দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমমানের শিক্ষার ব্যবস্থা বা একই ধরনের শিক্ষানীতি থাকা উচিত, নিদেনপক্ষে সাধারণভাবে সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য মোটামুটি এক পর্যায়ের পাঠ্যসূচি থাকাই বাঞ্ছনীয় বলে 'বেগম' মনে করে। কারণ তাতে—

> *অন্তত দেশের বিভিন্ন অংশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে মানসিকতার ব্যাপক ব্যবধান বিদ্যমান থাকবে না এবং এক অঞ্চলের ভবিষ্যত নাগরিকরা চিন্তা ও বুদ্ধির বিস্তৃততর জগতে অন্য অঞ্চলের নাগরিকদের তুলনায় দুঃখজনকরূপে পশ্চাৎপদ থাকবে না।*[১৪]

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার প্রতি খামখেয়ালী কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবের উদাহরণ পাওয়া যায় পত্রিকাটিতে। যেমন— শিক্ষা ডিরেকটরেট শব্দকোষ।[১৫] প্রায় সাড়ে তিন হাজার শব্দ সম্বলিত এই পুস্তক বের করে পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাদের নির্দেশ দেয়া হয় যে, পুস্তকে এর বাইরে কোনও শব্দ ব্যবহার করতে হলে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে 'বেগম'-এর মন্তব্য—

> *এই শব্দকোষে এমন অনেক শব্দ নেই যা আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি। আবার কতগুলো শব্দ এতে যোজনা করা হয়েছে যা আমরা ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হতে দেখিনি বা শুনিনি। অনুমতি নেয়ার এই বাধ্যবাধকতার পর সম্ভবত কোন আত্মসচেতন লেখকই আর পুস্তক রচনায় হাত দেবেন না। ইহাতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের এই হস্তক্ষেপ মোটেই শিক্ষার প্রয়োজনে করা হয় নাই।*[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা লাভের পর আপামর জনসাধারণের শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়নের কথা অনেকবার বলা হলেও বাস্তবে সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নে তৎকালীন সরকার আদৌ মনযোগী ছিলেন না বরং সমাজের নির্দিষ্ট একটি শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে বিদ্যমান অবস্থা টিকিয়ে রাখতে ও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উপযোগী ব্যবস্থা করেছিল। এ প্রসঙ্গে ভিকারুন্নেসা গার্লস স্কুলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয় যা ছিল শুধু ধনী ব্যক্তি ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারীদের মেয়েদের পাঠউপযোগী করে গড়ে তোলা। এখানকার বেতন, আনুষঙ্গিক খরচ এমন যার ফলে সাধারণ শ্রেণীর নাগরিকের মেয়েরা ইচ্ছা করলে এখানে পড়তে পারবে না। এ প্রসঙ্গে বলা হয়—

> *পাকিস্তানের গঠনোন্মুখ সময়ে যখন রাষ্ট্রের প্রতিটি অধিবাসীর জন্য সর্বাংগীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন সেখানে শুধু শ্রেণী বিশেষের উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কি সার্থকতা থাকতে পারে। এ-ব্যাপারটা আরো করুণ এবং দূরভিসন্ধিমূলক মনে হয় তখনই যখন দেখা যায় দেশের সামগ্রিক শিক্ষা সংকোচনের ওপর ভিত্তি করেই এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিষ্ঠা। ইহা শুধু সমাজের বৃহত্তর সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন এক ধরনের উন্নাসিক শিক্ষিত শ্রেণীর জন্ম দেয় যারা পরবর্তী সময়ে শুধু শোষণের পর্যায়গুলিকেই সহায়তা করবে। দেশের সংহতিতে বিভেদের সূচনার জন্যে এরা পরোক্ষ সহযোগিতা করবে।*[১৭]

পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে 'বেগম' এতটাই সচেতন এবং আন্তরিক ছিল যে শিক্ষা-সংক্রান্ত সরকারি যে কোনও বিধি নিষেধ কিংবা পদক্ষেপ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত, ভাবনা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। ফলে পূর্ব পাকিস্তান সরকার যখন সরকারি অথবা বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ কোনও ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি না করার জন্য নির্দেশ জারি করে তখনও 'বেগম' এই পদক্ষেপের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক ব্যাখ্যা করার মধ্য দিয়ে প্রকৃত অবস্থা কী হওয়া উচিত সে-বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছে। ছাত্রছাত্রীদের তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ জারি হলেও 'বেগম' মনে করে এটি একটি নেতিবাচক ব্যবস্থা। বরং—

> *তৃতীয় বিভাগ সম্পর্কে এরূপ কড়াকড়ি ব্যবস্থা না করে ছাত্রছাত্রীদের যাতে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হতে না হয় অর্থাৎ তাদের শিক্ষাব্যবস্থার মান যাতে উন্নত হয়, সেই উদ্যোগ গ্রহণ করলেই বরং যথার্থ ফল লাভ সম্ভব হতে পারে। তাছাড়া প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় যেখানে শতকরা ৮০/৯০ জন ছাত্রছাত্রী তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে থাকে সেখানে এই নির্দেশের ফলে দেশে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ হয়ে যায় না কি? বিশেষ করে এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীরা যদি আর উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পায় তাহলে তাদের ভবিষ্যত কিরূপ হবে এবং তাতে দেশের বেকার সমস্যা আরো বৃদ্ধি পাবে না কি?*[১৮]

প্রবেশিকা অথবা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা উপরের ক্লাসে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে– এমন দৃষ্টান্ত যে একেবারে বিরল নয়– সেই দিকে ইঙ্গিত করে 'বেগম' বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলকে পুনরায় বিবেচনার আহ্বান জানায়।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মুসলিম নারীর শিক্ষাক্ষেত্রে, কিংবা নারী আন্দোলন, রাজনীতি যাই বলা হোক না কেন পিছিয়ে থাকার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সমাজের পর্দাপ্রথা। এই একটি প্রথার কারণে দেখা যায়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের চেয়ে অপরাপর সম্প্রদায় অধিকতর অগ্রসর। মূলত নারীর জন্য সমস্যা পর্দাপ্রথা নয়, সমস্যা এই প্রথার কড়াকড়ি। নিজেকে যথাযথভাবে আবৃত করাই যথেষ্ট ছিল না, প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর চলাফেরা সীমিত করে ফেলা হয়েছিল এই পর্দার দোহাই দিয়ে, যা এক ধরনের অবরোধ বৈ কিছু নয়। সম্পাদকীয়তে এ প্রসঙ্গে বলা হয়—

> *ইসলামে চোখ, মুখ ও মনের পর্দার উল্লেখ আছে। অবরোধ প্রথা বাস্তবত সমর্থনের যোগ্য হলে চোখ মুখ বা মনের পর্দার প্রশ্নই ওঠে না। চোখ, মুখ ও মনের পর্দায় মানুষকে সত্যিকারভাবে মানসিক শক্তি ও সংযমের অধিকারী করে গড়ে তোলবার শুভ ইংগিত আছে।*
>
> *যেসব মুসলিম রাষ্ট্রে শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হয়েছে, পর্দার বিকৃত ধারণা সেখানে জয়ী হয়ে থাকতে পারেনি।*[১৯]

'বেগম' নারীসমাজকে শিক্ষিতা, কর্মজীবী হিসেবে গড়ে উঠার অনুপ্রেরণা দিলেও সর্বাগ্রে নারীকে দেখতে চেয়েছে সেবিকা হিসেবে। কী পারিবারিক জীবনে, কী সামাজিক জীবনে, কী কর্মক্ষেত্রে— সর্বত্র 'বেগম' নারীর মাতৃময়ী সেবার রূপটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। সেবার মধ্য দিয়েই নারীসমাজ সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কর্মে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ কারণেই বৃত্তি হিসেবে আর সব সেবার চেয়ে নার্সিং পেশাকে সর্বোত্তম বলা হয়েছে এবং এই পেশায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে 'বেগম'। পূর্ব বাংলার নার্সিং শিক্ষা আন্দোলন, বাধ্যতামূলক নার্সিং শিক্ষার প্রয়োজন, নার্সদের উচ্চ শিক্ষাদান, পাকিস্তান নার্সিং কাউন্সিল, নার্সিং বৃত্তির প্রসার— এরূপ বিভিন্ন শিরোনামে এই পেশার প্রতি নারীদের আগ্রহী করে তোলা, এই পেশার প্রতি আপামর জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সামাজিক সমর্থন মূল ভূমিকা পালন করবে বলে 'বেগম' মনে করে। এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয়তে বলা হয়—

> *সামাজিক সমর্থন ছাড়া নার্সিং বৃত্তির প্রসার হওয়া সম্ভব নয়। তবে এ-কথাও সত্য সৎকাজে সবসময় গোটা সমাজের সমর্থন পাওয়া যায় না। রক্ষণশীল দল আপ্রাণ চেষ্টা করে পুরাতনকে আঁকড়ে ধরতে, আর নবীনের দল চায় কুসংস্কারকে ভেঙ্গে আধুনিকতাকে প্রাধান্য দিতে। কিন্তু প্রগতির কাছে কুসংস্কার সব সময় হার মেনেছে। আমাদের দেশেও এই নিয়মের পুনরাবৃত্তি হবে। শিক্ষিতা মহিলাদের এটাই হল বড় দায়িত্ব। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁদের একথা প্রচার করতে হবে যে, মানবিক আদর্শবোধ থেকেই মেয়েরা নার্সিং বৃত্তি গ্রহণ করে। সমাজের প্রতিকূল মনোবৃত্তির কাছে তাদের পরাজয় বরণ করলে চলবে না।*[২০]

'বেগম'-এর প্রথম প্রকাশকাল থেকে পরবর্তী পর্যায়গুলোতে বাংলার যে নারীসমাজের ছবি আমরা পাই তা অনেক প্রাগ্রসর শ্রেণীর প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে যে নারীর পুনর্জাগরণ, পুনর্গঠন ও পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বিশ শতকে এসে সেই প্রক্রিয়া একটি

Dhaka University Institutional Repository

নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। মূলত বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মধ্যে রাজনৈতিক, আইনগত, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রসমূহে বাংলার নারীসমাজ বেশ অগ্রসর হয়। তদুপরি নারীদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে ন্যায্য অধিকার আদায়ে সম্মিলিত এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করা কিংবা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শুধু নারীদের নিয়ে বিভিন্ন সমিতি, সংঘ, ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯০০ সালের মধ্যেই প্রথম মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, যা উদার সংস্কার, নারীর মর্যাদা এবং জাতীয় আন্দোলনের যোগসূত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য শক্তি যোগায় এবং নারীসমস্যা বিষয়ে সমর্থন তৈরি করে।[২১] মুসলিম নারীদের চাহিদা পূরণে সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'পর্দা ক্লাব'। যার মধ্য দিয়ে অবরুদ্ধ থাকা মহিলারা বাইরে এসে তাদের সমস্যা নিয়ে সভা-সমাবেশ ও আলোচনা শুরু করে, ফলে সামাজিক কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণের মাত্রাগত বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। শুধু পর্দাপ্রথাই নয় নারীশিক্ষা, নারীর স্বাধীনভাবে আর্থিক আয়ের প্রসংগ, রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ভোটাধিকার, সর্বোপরি নারী-পুরুষ সমানাধিকার ইত্যাকার বিষয়ে এই জাতীয় সংঘ বা সমিতিগুলো সুস্পষ্ট ও দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করে। 'বেগম' পত্রিকায় এই সংঘ-সমিতির গুরুত্ব বারবার নতুন করে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন ১৯৪৮ সালের 'বেগম'-এর ৮ম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়—

> *নতুন আদর্শ ও কর্মপন্থা নিয়ে নারীদের নামতে হবে এবং তার জন্যে সমগ্র দেশে গড়তে হবে অগণিত সংঘ সমিতি। বাংলার অশিক্ষিতা নারীদের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিতরণের ভার গ্রহণ করবে নারীদের এইসব সমিতি বা সংঘ। নারীদের এই সংঘ সমাজেরই অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে। পুরুষের একচোখা সমাজে নারীর স্থান সম্মানীয় পর্যায়ে নেই। সুতরাং সমাজে নারীর প্রকৃত স্থান দখল করতে হলে তাদিগকে অগ্রসর হতে হবে এইসব সংঘ এবং প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে।*[২২]

মেয়েদের সঞ্চয় অভ্যাসকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছে 'বেগম'। রাষ্ট্রের উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত পুঁজি সৃষ্টি ও পুঁজি নিয়োগের জন্য সঞ্চয়ের গুরুত্ব পাঠক সমাজের নিকট ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে এ সাময়িকপত্র। পাশাপাশি বাঙালি নারীসমাজে সঞ্চয়ের যে প্রচলিত ধারণা অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি তথা সোনা-রূপার অলঙ্কারের সমালোচনাও করা হয়েছে। কারণ 'বেগম' মনে করে এর মধ্য দিয়ে মানসিক শান্তি এলেও, একটি পরিবার দুর্দিনের আশঙ্কায় বর্তমানে নিশ্চিন্তে দিনাতিপাত করতে পারলেও তাতে দেশ এবং জনগণের কোনই লাভ হবে না। কারণ এই সঞ্চিত সম্পদ বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়। তাই নিখাদ অর্থনীতিবিদের মত 'বেগম' পরামর্শ দেয়—

> *আমাদের দেশে বিস্তর সোনা রূপার গহনা কিনে রাখাকে এক ধরনের সঞ্চয় বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। এই ধারণা নিয়ে প্রায় সচ্ছল পরিবারই সোনা রূপা কেনার দিকে উৎসাহিত হয়। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থা অর্থের অপচয়ের নামান্তর এবং তা জাতীয় অগ্রগতি প্রচেষ্টার পথে অন্তরায়। সোনা রূপা কেনার অর্থ হচ্ছে টাকা পয়সা আটকে রাখা এবং তাতে পরিবারের বা সমাজের কোন কল্যাণ সাধনের সম্ভবনা নেই।*

Dhaka University Institutional Repository

সুষ্ঠু সঞ্চয়ের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি। ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে অথবা ইন্স্যুরেন্সে টাকা খাটালে তা ভবিষ্যতে জমা বা বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণই যে শুধু বৃদ্ধি করে তা নয়, সেই অর্থ সমাজ তথা জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নিয়োজিত হয়ে সামগ্রিকভাবে সকলের উপকার সাধন করে। বলা বাহুল্য স্বয়ং জমাকারী এবং বিনিয়োগকারীও এই কল্যাণের অংশীদার হন।[২৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রেনেসাঁসের আলোকে হিন্দুসমাজের মেয়েদের অধঃপতিত অবস্থার উন্নতি হয় এবং বিশ শতকে বাংলার নারীসমাজ রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। সংস্কারবাদী এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সকল পর্যায়েই নারীর অংশগ্রহণ দৃষ্টিগোচর হয়।[২৪] যদিও তাদের মধ্যে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুর সংখ্যা ছিল বেশি। তবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মুসলিম নারীর অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং প্রথম কয়েক দশকের শেষে এই অংশগ্রহণ দৃঢ়ভাবে এগুতে থাকে। নারীজাগরণের সূত্রে বিভিন্ন শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের নারীরা একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করেছে এবং ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু, মুসলিম, পার্সি, খ্রিস্টান, শিখ বা বৌদ্ধ নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এই একতা ছিল এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।[২৫]

কিন্তু ভাগাভাগির রাজনীতি ও পাকিস্তানের দাবি ভারতীয় নারী আন্দোলনে মুসলিম নারীদের অংশগ্রহণের উপর কালোছায়া ফেলে। শুধু ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়ে পাকিস্তান নামক একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং এই ধর্মই বিরাট ব্যবধানে থাকা দুটি ভৌগোলিক অংশের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। সাবেক পূর্ব বাংলা দ্রুত পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয় এবং হঠাৎ করেই বাংলা তার হাজার বছরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্রোতধারা হারিয়ে ফেলে। নতুন রাষ্ট্রের ধর্মনির্ভরতা নারীর জন্য এক সঙ্কটজনক অবস্থা সৃষ্টি করে। ফলে শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, রাজনীতি সর্বত্র নারীর অংশগ্রহণ নতুন করে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। ধীরে ধীরে এ-সংকটাবস্থার অবসান হতে থাকে এবং বিদগ্ধজনের পাশাপাশি পত্রপত্রিকাগুলোও এক্ষেত্রে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে। পূর্ব পাকিস্তানের নারীরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে কিনা এবং করলেও তা কী মাত্রায় এ প্রশ্ন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তর্কের জন্ম দিয়েছে। যেমন 'বেগম'-এর সম্পাদকীয়তে প্রকাশ করা হয়—

মেয়েরা রাজনীতিতে যোগদান করবে কি? পাক ভারত উপমহাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর মেয়েদের কাছে এই প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড় বলে মনে হচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গঠনমূলক কার্যসমূহের পরিকল্পনা নর ও নারীর মধ্যে ভেদরেখা অনেকটা নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছ। শোভাযাত্রায়, পিকেটিং, কারাবরণ ইত্যাদিতে মেয়েরা পুরুষের সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এমনকি কোন কোন সময়ে মেয়েরা বেশী যোগ্যতাও দেখিয়েছে। গান্ধীর পরিচালনাধীনে স্বাধীনতা সংগ্রামে মেয়েরা দলে দলে যোগদান করেছে। কিন্তু মেয়েদের যদি সমঅধিকারের ভিত্তিতে রাজনৈতিক অধিকার লাভ করতে হয়, তাহলে ইহা কেবলমাত্র কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে নারীদিগকে পুরুষের সমান

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের পরিণতি হিসাবেই যে অধিকার জন্মায় তা আমাদের মনে রাখতে হবে সকলের আগে।[২৬]

রাষ্ট্রে শাসন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও 'বেগম' ছিল সোচ্চার। ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ৩১২ জন সদস্য নিয়ে পূর্ব বাংলার নয়া ব্যবস্থাপক পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত হয় যেখানে মহিলাদের জন্য মাত্র ১১টি আসন সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়। জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ প্রতিনিধিত্বের এই অসমতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এ প্রসঙ্গে অভিযোগ তুলে ধরা হয়—

আমাদের প্রশ্ন ৩১২ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১১ জন মহিলা সদস্যার আসন সংরক্ষণের সুপারিশ করা হল কেন? আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের শিক্ষার হার ও অন্যান্য নানা বিষয়ে আমরা পুরুষ সমাজের পিছনে রয়েছি। রাজনৈতিক কাজে দক্ষতা দেখাতেও আমরা পুরুষের তুলনায় পশ্চাতে পড়ে রয়েছি। কিন্তু এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য যদি আমাদের ভাগ্যে পুরুষদের তুলনায় মাত্র শতকরা ৩$^{১}/_{২}$ ভাগ আসন নির্ধারিত হয়, তবে তার প্রতিবাদের পেছনে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হল নারী, অথচ তাদের প্রতিনিধিত্বের বেলায় সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও সাধারণ বুদ্ধি বহির্ভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও মর্মান্তিক।[২৭]

রাজনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়ার পাশাপাশি নারী পুরুষ সমানাধিকারের প্রতি একটি উদারপন্থী পত্রিকা হিসেবে 'বেগম' সমর্থন ব্যক্ত করেছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মহিলাদের সমান অধিকার দানের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হওয়ার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে 'বেগম'। স্বাগত বক্তব্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে এই বলে যে—

আমরা যে যুগে বাস করছি এবং যে দ্রুত উন্নয়ন অভিযানের মধ্য দিয়ে উত্তরোত্তর এগিয়ে চলার প্রয়াস পাচ্ছি, তাতে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারীসমাজকে সামান্যতম অধিকার থেকেও দূরে সরিয়ে রাখা চলে না। অথচ বর্তমান বিশ্বের বহু অঞ্চলে এখন পর্যন্ত নারী রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবার জীবনে অধিকার বঞ্চিতা। জাতিসংঘের নয়া উদ্যোগ এ-ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা সমাধানের পথকে সহজ করেছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।[২৮]

যদিও একই সঙ্গে 'বেগম' এও মনে করেছে— এহেন সমানাধিকার যেন কখনই শালীনতা অতিক্রম না করে কিংবা পারিবারিক জীবনের প্রয়োজনকে ছাপিয়ে না যায়।[২৯] এ প্রসঙ্গে বলা হয়—

রাজনৈতিক অধিকার লাভ সম্বন্ধে আমাদের আরো একটা বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। ঘর-সংসারের কাজকর্ম মেয়েদের রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগদানের উপযোগী ট্রেনিং দিতে পারে না। তেমনি রাজনীতি ক্ষেত্রে এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরুষের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করলে ঘর সংসার ভেঙ্গে পড়ারও আশংকা আছে। কাজেই সবদিকে নজর রেখে কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রতিনিধি স্যার আবদুর রহমান কমিশনের এক বৈঠকে নারী পুরুষের সমানাধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করে পুরুষদের বহুবিবাহের পক্ষ অবলম্বন করে বলেন, তাহলে মেয়েদেরকেও বহু বিবাহের অনুমতি দিতে হয়। কোনও মুসলিম দেশে এ প্রস্তাব কার্যকরী নয়। স্যার আবদুর রহমানের এই ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করে 'বেগম' এহেন উক্তির অসারতা প্রমাণের চেষ্টা করে, বলা হয়—

> *পৃথিবীতে বিগত অনেকগুলো বছর ধরে নারী স্বাধীনতা ও পুরুষের সাথে নারীর সমানাধিকারের দাবীতে আন্দোলন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত ও স্থিতধীসম্পন্ন প্রত্যেক নারী পুরুষই হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, নারীর স্থান কেবল রান্নাঘর নয়, কেবল সংকীর্ণতম গৃহস্থালী নয়। আদিম যুগের নারীর মতো আজকের নারীরও প্রয়োজন শিক্ষা, সভ্যতা ও সামাজিক উন্নয়নে পুরুষের সাথে সমানভাবে এগিয়ে যাওয়া। নইলে কেবল নারীসমাজই বঞ্চিত হবে না— সাথে সাথে পৃথিবীর একক প্রগতি ও উন্নতির পক্ষে তা হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর। আশ্চর্য ও দুঃখের কথা স্যার আব্দুর রহমান তা বুঝতে পারেননি। তিনি বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদে নারীর সমানাধিকার দিতে রাজী নন। তিনি কি তবে এই চান যে, নারী পণ্য সামগ্রীর মতো কেবল একতরফা ইচ্ছার উপরই দেহ বিক্রয় করবে এবং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করবে? লজ্জার কথা, তিনি পুরুষের বহুবিবাহ সমর্থন করেন। সারা পৃথিবীর মেয়েরা কখনোই একাধিক স্বামী ও স্ত্রী রাখা সমর্থন করেন না এবং ছেলেদের মত মেয়েদের বিধবা বিবাহ সমর্থন করে। মুসলিম দেশসমুহে বহুবিবাহ প্রচলিত বলেই নমস্য স্যার রহমানের এরূপ রক্ষণশীল মনোভাব থাকবে এ হাস্যকর।*[৩১]

বহুবিবাহ প্রসংগে এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আরো অনেক স্থানেই 'বেগম' তীব্র ভাষায় মত ব্যক্ত করেছে। বহুবিবাহের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক সকল ধরনের কুফলই সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছে। বলা হয়—

> *বহুবিবাহের কুফল আজকের দিনে অন্ততঃ মুসলিম সমাজের কারও কাছে অবিদিত নয়। দ্বিতীয় বিবাহের ফলে অনেক সুখের সংসার চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যার ন্যায় বিস্ময় পরিণতি লাভ করেছে। এর দ্বারা জীবিতা প্রথমা পত্নীর প্রেম ও সুখের প্রতি অমর্যাদাতো দেখানো হয়ই, পরন্তু বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়। সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অবাঞ্ছিত ব্যবধান ক্রমেই ঘনিয়ে আসে এবং সাংসারিক খুঁটিনাটিকে কেন্দ্র করে অশান্তিমূলক আবহাওয়া বিরাজ করে। সামাজিক ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বহুবিবাহের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত বিষময় হয়ে দাঁড়ায়। বহুবিবাহের ফলে পারিবারিক আয়ের অনুপাতে ব্যায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি যেমন স্বাভাবিক তেমনি অহেতুক জন্মহার বৃদ্ধির ফলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয়। বিশেষ করে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এমন সুষ্ঠু ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, যা বহুবিবাহজনিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ সহ্য করতে পারে। কাজেই সাংসারিক, সামাজিক ও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বহুবিবাহকে কোন ক্রমেই সমর্থন করা যেতে পারে না।*[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

বহুবিবাহকে সমর্থন করে এরূপ অনেক ব্যক্তিই এক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়তের ওজুহাত দেখায়। মূলত ধর্মভীরু বাঙালি মুসলিমের কাছে বহুবিবাহের সপক্ষে একমাত্র যুক্তিই হচ্ছে ইসলামি বিধান। কিন্ত ইসলামি বিধানের প্রকৃত সত্য জানলে কিংবা মানলে যে বহুবিবাহের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো যায় না 'বেগম' তা স্পষ্ট করেছে। এ প্রসংগে 'বেগম'-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়—

> *বহুবিবাহের পক্ষপাতী এবং ধর্মের ছত্রতলে আত্মসত্তা বিলোপকারী কোন কোন লোক হয়তো এ-ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তকে তাঁদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবেন। আমরাও কোনক্রমেই শরীয়তের অসম্মান করার পক্ষপাতী নই কিন্ত অনুরূপ ক্ষেত্রে আমরা শুধু এইটুকুই নিবেদন করতে চাই যে, শরীয়তে একাধিক বিবাহের যে বিধান রয়েছে, তা সাংসারিক ও সামাজিক শান্তির পরিপ্রেক্ষিতেই করা হয়েছে এবং সেই কারণে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থবার দার পরিগ্রহ সম্পর্কে কতিপয় কঠোরতর ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ শর্ত আরোপ করা হয়েছে। শরীয়তের কথা যদি ওঠেই, তাহলে এই শর্তাবলীকে পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ রূপে মেনে চলার প্রশ্নও উঠবে। প্রথমা স্ত্রীকে জীবন্মৃত রেখে তাঁর প্রতি অপমান, অবহেলা প্রদর্শন করে, নিজের খেয়াল খুশিমতো দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করাকে শরীয়ত কোন দিনই সমর্থন করে না। একাধিক স্ত্রী রাখতে হলে তাদের প্রত্যেকের চাহিদামতো সামগ্রিক সন্তুষ্টি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করতে না পারলে তাতে শরীয়তের খেলাপই হবে।*[৩৩]

বহুবিবাহ কিংবা যথেচ্ছ তালাকের ন্যায় নারীর প্রতি এরূপ আরো অনেক অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে এভাবেই নারীরা মুখর হয়। ক্রমে মহিলাদের সামাজিক অধিকার রক্ষার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন তীব্রতর হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এতদ্‌সম্পর্কে তৎপর হয় এবং নিখিল মহিলা সমিতিসহ পাকিস্তানের উভয় অংশের মহিলা প্রতিনিধি এবং বিচার বিভাগীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা বিবাহ ও পারিবারিক আইন কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সরকার ১৯৬১ সালে 'মুসলিম ফ্যামিলি' ল অর্ডিন্যান্স (মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স) জারি করে যা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একটি মাইলফলক ছিল। এই অর্ডিন্যান্সের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, যদৃচ্ছ বিবাহ ও তালাক নিয়ন্ত্রণ। এই অর্ডিন্যান্সে পবিত্র কোরান ও হাদিস অনুযায়ী সমাজে মহিলাদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে— যদিও অনেকখানি 'কেতাবে'— বাস্তবে নয়— তবুও এই অর্ডিন্যান্স পরবর্তীকালে সংগ্রামী নারীদের সামনে এক আদর্শ হয়ে দেখা দেয়।

বিবাহ সংক্রান্ত আর একটি বিষয়ে 'বেগম' স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছে। তা হলো বিবাহের ব্যয় ও যৌতুক। বিবাহ অনুষ্ঠানে কয়েক শ্রেণীর ব্যয়বহুল আচরণ পালন করা একপ্রকার সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়। ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে বহুপরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছে। ঢাক-ঢোল, নৃত্যগীত, খানা-পিনা এবং আরও বহুপ্রকার বিলাসিতাপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হত। সকল ক্ষেত্রেই যে কন্যাপক্ষ নিজে উদ্যোগী হয়ে, নিজের আনন্দে তা করে থাকেন তা নয় বরং সামাজিক আচার-বিচারের কারণেও এসব বিলাসিতায় অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ সম্পর্কে বলা হয়—

> *এদেশে মুসলমান সমাজেও বিবাহে যৌতুকের প্রশ্ন ক্রমশঃ জটিল সমস্যারূপে দেখা দিচ্ছে। বস্তুত আজ দেশে বিবাহের যৌতুক নিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাদের দুশ্চিন্তার অবধি নেই।*

Dhaka University Institutional Repository

কনে সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী ও শিক্ষিতা হলেও বিয়ের সময় তার সংগে যথাযথ যৌতুক দিতে সক্ষম না হলে স্বামীর ঘরে তাকে সর্বদাই লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। অনেকে আবার বিবাহকালে ঘড়ি, আংটি, বাড়ী, গাড়ী, টাকা-পয়সা ইত্যাদির কথা সরাসরিভাবে উল্লেখ করে থাকেন। এই সমস্যা সৃষ্টির ব্যাপারে দেশের একশ্রেণীর লোভী যুবক ও মাতাপিতাই প্রধানতঃ দায়ী। আর সবচেয়ে দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে, শিক্ষিত সমাজেই এই বিষ বেশী করে ছড়িয়েছে। বরের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিবাহকালে কিছুটা যৌতুক তার দাবী করা চাই-ই। যুবকদের এই মনোভাবের ফলে দরিদ্র পিতামাতাকে নানা আর্থিক অনটনের ভিতরেও যৌতুকের খরচা যোগাতে হয়।[৩৪]

পণপ্রথার তীব্র সমালোচনা করে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে— 'বাণিজ্যিক বিবাহ বন্ধ হোক'। যৌতুকপ্রথা হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই এমন এক বাড়াবাড়ি রূপ নিয়েছে যে, বিয়ে একটি পবিত্র সামাজিক প্রথা না হয়ে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছে। পাত্র পক্ষ বিয়েকে অর্থ আদায়ের একটা চমৎকার উপায় হিসেবে ধরে নিয়েছে। আর এর যাঁতাকলে পড়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতারা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। 'বেগম' সম্পাদক তাই এই মানসিকতার সমালোচনা করেছেন কড়া ভাষায়—

বিবাহ বাণিজ্য নয়। বিবাহে পণপ্রথা বা বাধ্যতামূলকভাবে পাত্র-পাত্রীর কাছ থেকে যৌতুক আদায় করা ইসলাম সমর্থন করে না । কেননা বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। যার উপর সমাজ তথা বিশ্বের অগ্রগতি ও মানুষের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। পণপ্রথা এই পবিত্র কার্যে শুধু যে তিক্ততা ও অভিভাবকের জন্য অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাই নয়, নানারকম বিশৃঙ্খলা, অনাচার এবং অপ্রীতিকর ঘটনারও উদ্ভব ঘটায়।[৩৫]

বিয়ে— তা বহুবিবাহ কিংবা বাল্যবিবাহ যাই হোক না কেন এটি একটি সামাজিক সমস্যায় পর্যবসিত হয়েছে। এরই সঙ্গে বিয়ে সংক্রান্ত আর একটি সমস্যার উদ্ভব ঘটে তা হলো যথাযথ সময়ে বিয়ে না হওয়া। আর এই সমস্যায় পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিকমাত্রায় জর্জরিত। প্রায় সবক্ষেত্রেই বিবাহযোগ্যা মেয়েদের মাতাপিতাকে চিন্তান্বিত দেখা যায়, কিন্তু অপরপক্ষে ছেলের মাতাপিতাকে এ বিষয়ে চিন্তা করতে দেখা যায় না। সঠিক সময়ে মেয়েদের বিবাহ না ঘটার প্রধানতম কারণ বিবাহের উপযুক্ত পাত্রের সংকট। যদিও হিন্দু ও মুসলমান— উভয় সমাজে এই বিয়ে সমস্যা দেখা যায় এবং হিন্দুসমাজে এ সমস্যা অনেক বেশি প্রকট— তবে উভয় সমাজে সমস্যার কারণটিতে তারতম্য রয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে 'বেগম' লেখে—

হিন্দু মেয়ের বিবাহ সমস্যা প্রধানত আর্থিক লাভ লোকসানের উপর ভিত্তি স্থাপন করে দাঁড়িয়ে আছে। অপরদিকে মুসলিম মেয়ের অভিভাবকরা যে কারণে মনের মতো ছেলে পান না অর্থাৎ শিক্ষিত ও উপার্জনশীল ছেলে পান না সেটি হচ্ছে শিক্ষাগত ব্যাপার।

মুসলমান সমাজে ছেলেদের ও মেয়েদের শিক্ষার গড়পরতা তারতম্য এত বেশী সংখ্যায় যে এখনো একটি মাত্র গ্রাজুয়েট মেয়ের জন্য অনায়াসে একাশিটি এম.এ. পাশ পাত্রের আবেদন

Dhaka University Institutional Repository

এসে পৌঁছবে অথচ একটি গ্রাজুয়েট ছেলের জন্য একটি ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে যোগাড় করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। ফলে ছেলেরা বাধ্য হয়ে বিয়েতে দেরী করে। কিন্তু মেয়েদের ঠিক বয়সে বিয়ে না হলে চলে না।[৩৬]

বিবাহ প্রসঙ্গে অন্তত একটি বিষয়ে 'বেগম' পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছে। সেটি হলো নারীর সৌন্দর্যচর্চা কিংবা রূপচর্চা। সমাজে সৌন্দর্যচর্চার বিষয়টি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় না বরং ক্ষেত্র বিশেষে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সৌন্দর্যচর্চা নারীর ব্যক্তিত্বেরই একটি দিক এবং ব্যক্তির আর সব দিকের মতো সৌন্দর্যচর্চার দিকেও মনোযোগী হতে হয়, নতুবা অনাদরে, অবহেলায় নারীর ব্যক্তিত্বের এ দিকটির বিকাশ ঘটবে না। 'বেগম' মনে করে—

রূপচর্চা কেবল ত্যাজ্য নয়, এটা একটা নির্লজ্জ মনেবৃত্তি বলেই বহু মেয়ের বিশ্বাস। অথচ রূপচর্চা কেবল সংসারের সৌন্দর্য ও দাম্পত্য জীবনের গভীরতা বর্ধনের জন্যেই নয়, উন্নত রুচির পরিচায়কও যেমন, তেমনি রূপচর্চা স্বাস্থ্যচর্চার সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বহু দুঃখ ও দুঃস্থতার মধ্যেও সৌন্দর্য মানুষের মনে কিছুটা শান্তি দেয়, জীবনে উৎসাহ ও উদ্যম ফিরিয়ে আনে, আশায় বুক বাঁধতে সাহায্য করে। রূপচর্চার অর্থ যৌন আবেদনের সৃষ্টি নয়। পোষাক পরিচ্ছদে, চলায়-বলায় একটি সহজ স্বাভাবিক ছিমছাম ভাব, একটি নিটোল শৃঙ্খলা আনয়নের নামই রূপচর্চা, যা মানুষের মনে অপূর্ব আনন্দ ও তৃপ্তির সাড়া তোলে।[৩৭]

সৌন্দর্যচর্চাকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে 'বেগম'। অর্থাৎ শুধু দৈহিক রূপচর্চাই নয়, সমগ্র পরিবারের শ্রীবিধানের কথাও 'বেগম' বলতে চেয়েছে। এতে বলা হয়—

আমাদের সৌন্দর্যচর্চা কথাটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয় না বলেই এ-সম্পর্কে দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবকাশ আছে। এখানে সৌন্দর্যচর্চার অর্থ কেবল ব্যক্তিগত বা কেবলমাত্র দৈহিক রূপচর্চাই নয়। নিজেকে যুক্ত রেখে সমগ্র পারিবারিক জীবনে শ্রীবিধানই হলো সৌন্দর্যচর্চার ব্যাপক অর্থ। নিজের দৈহিক সৌন্দর্য বিধানও যেমন সবদিক থেকে প্রয়োজন তেমনি ঘর-দোর আসবাবপত্র থেকে আরম্ভ করে ব্যবহার, কথাবার্তা, চলাফেরা সবকিছুতেই সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে হবে। সৌন্দর্যবোধকে সর্বদা ও সর্বথা সজাগ রাখাই হচ্ছে সৌন্দর্য বিধানের প্রধান সহায়।[৩৮]

রূপচর্চার সঙ্গে স্বাস্থ্যচর্চার বিষয়টিও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তবে শুধু সৌন্দর্যের জন্যই নয়, সুস্থ, সুখী ও নীরোগ জীবনের জন্যও স্বাস্থ্যচর্চা অপরিহার্য। যদিও বাঙালি মাত্রই বিষয়টিকে চিরদিন অবহেলা করে থাকে। এক্ষেত্রে বাঙালি নারী আরও এক কাঠি বাড়া। বাঙালি বিশেষত বাঙালি মুসলিম মেয়েদের স্বাস্থ্য অনেক নাজুক। এমন কতকগুলো রোগ এদেশের অধিকাংশ মেয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে যা স্ত্রীরোগ নয় অথচ পুরুষরা এই রোগে ভোগে অনেক কম। এর একমাত্র কারণ নারীদের নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি অযত্ন, অবহেলা এবং নারী পুরুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিষমতা। 'বেগম'-এর সম্পাদকীয় বিষয়টিকে দেখিয়েছে এভাবে—

Dhaka University Institutional Repository

যেসব নারী ঘরেই আবদ্ধ থাকে তাদের সংখ্যাই আমাদের দেশে বেশী। ঘরে এদের এমন কতকগুলো কাজ করতেই হয় যা স্বাস্থ্যের জন্য হানিকর। অথচ উপযুক্ত ব্যবস্থায় সেই ক্ষয়ক্ষতি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার কোন প্রচেষ্টাই আমাদের নেই। বাইরের মুক্ত হাওয়ায় কিছুক্ষণ বিচরণ তো দূরের কথা ঘরের মধ্যে থেকেও যেটুকু স্বাস্থ্যচর্চা সম্ভব তাও আমরা করি না। আমাদের দেশের মেয়েদের একটা নির্বিকার, নিরাসক্ত ভাবও এর জন্য দায়ী। পরিবারভুক্ত পুরুষদের সবটুকু খাইয়ে নিজেরা আধপেটা যা তা দিয়ে খাওয়া, যথাসময়ে গোসল না করা, ইচ্ছে করে ময়লা কাপড়-চোপড় পরে থাকা এবং সর্বদা গম্ভীর হয়ে থেকে শালীনতার ভান করা প্রভৃতি বহু বদ অভ্যাস আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে বিদ্যমান।[৩৯]

সৌন্দর্যচর্চাকে সমর্থন করলেও বিশ্ব সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে 'বেগম'। মূলত দরিদ্র বিশ্বে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা আাহ্বানের তাৎপর্য কী? কিংবা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক তারতম্য থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সৌন্দর্যের সর্বজনীন মাপকাঠি নির্ধারণ আদৌ সম্ভব কিনা? এ-প্রশ্নগুলো বেগম করেছে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে— এ-সম্পর্কে বলা হয়—

সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা ভালো কি মন্দ এই নিয়ে তর্ক না করেও একথা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করা যায় যে, এই বিশ্ব সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার পেছনে কোন প্রকার সুরুচির কার্যকরী দায়িত্ব ছিলনা। আমেরিকার গণিকা সংস্কৃতির নিকট সমগ্র পৃথিবীকে ভিন্নতর উপায়ে দীক্ষিত করারই অপচেষ্টা এটি। প্রত্যেকটি দেশ যদি নিজস্ব সৌন্দর্যচর্চায় ঐতিহ্য অনুযায়ী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতো তাহলে অন্য কথা, কিন্তু আমেরিকার প্রবর্তিত স্নানের পোষাক প্রভৃতি নগ্ন ও অশ্লীল সজ্জায় সজ্জিত হয়ে প্রতিযোগী মহিলারা নিজেদের দেশীয় কোন বৈশিষ্ট্যই এখানে দেখাতে পারেন নাই। ভারতীয়দের চুল কালো, চোখ কালো– আমেরিকানদের সাদা চোখে এদের সৌন্দর্যের মাপকাঠি কি? চীনাদের নাক নীচু তাই বলে কি তারা সুন্দরী নয়?[৪০]

পশ্চিম পাকিস্তান সরকার ১৯৬৬ সালে প্রদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সব ধরনের নৃত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের এহেন সিদ্ধান্তকে হাস্যকর ও উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করেছে 'বেগম'। সংস্কৃতির নামে ঐতিহ্যবিরোধী কার্যকলাপ ও উচ্ছৃংখলতার অবসানের অজুহাতে একতরফাভাবে কেবল মেয়েদের সমুদয় সাংস্কৃতিক জীবনের উপর বিধি নিষেধ আরোপের মধ্য দিয়ে সমাজের একটি বৃহত্তর চেতনার দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে 'বেগম' স্বাগততো জানায়ই নি বরং এর হাস্যকর ও উদ্বেগজনক দিক স্পষ্ট করে লিখেছে এইকথা—

হাস্যকর মনে হতে পারে এই কারণে যে, এতে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের পরিবর্তে সরকার এমন একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন যাতে সমাজের সাংস্কৃতিক চেতনাকেই সমূলে উৎখাত করার ব্যবস্থা হয়েছে। অর্থাৎ দেহের কোন একটি ব্যধির প্রতিকারের পরিবর্তে সমগ্র দেহটারই পঞ্চত্ব প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ উল্লেখিত ব্যবস্থা দেশে নারীসমাজের নিকট উদ্বেগজনক মনে হতে পারে এই কারণে যে, তাতে পুরনো ও

Dhaka University Institutional Repository

> *জরাজীর্ণ সমাজব্যবস্থার মূলে আঘাত হানার পরিবর্তে সরকারী উদ্যোগ পশ্চাৎমুখী একটি সামাজিক অবরোধ প্রচেষ্টাকেই আঁকড়ে ধরা হয়েছে। অথচ যুগের পরিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মেয়েদের সাংস্কৃতিক চেতনার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নিয়েছি। কেবল তাই নয়, সরকারী বেসরকারীভাবে আমরা তার পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকি এবং তার ঐতিহ্য নিয়ে দেশে বিদেশে গর্ব বোধও করি। একই সঙ্গে আমরা বিদেশী মহিলা সাংস্কৃতিক দলকে সম্বর্ধনা জানাব ও সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হিসেবে আমাদের মেয়েদের বিদেশে পাঠাব এবং অন্যদিকে দেশে মেয়েদের যাবতীয় সাংস্কৃতিক চেতনার উপর বিধি নিষেধ আরোপ করবো, আজকের দিনে অতি অনুন্নত জাতিও এরূপ কোন উদ্ভট ব্যবস্থার কথা কল্পনা করতে পারে না।*[৪১]

একটি দেশ এবং জাতির নৈতিকতা কীরূপ হওয়া উচিত কিংবা নৈতিক মান বজায় রাখতে সামাজিক সাংস্কৃতিক কোন্ দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা করা উচিত সংবাদপত্র-সাময়িকপত্রগুলো সেই নির্দেশনা দিয়ে থাকে। সমাজে কী হচ্ছে বা ঘটছে শুধু তার বিবরণ তুলে ধরাই শেষ কথা নয়, কী হওয়া উচিত, সততা-নৈতিকতা বজায় রাখতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত এ বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করাও সংবাদপত্র-সাময়িকপত্রের করণীয়। চলচ্চিত্র প্রসঙ্গেও 'বেগম' এরূপ মনোভাবই পোষণ করে। চলচ্চিত্র সব ধরনের দর্শক-শ্রোতার কথা মনে রেখেই তৈরি করা হয়। তারপরও দেখা যায় এমন সব চলচ্চিত্র মুক্তি পায়, বই বের হয় যা তরুণ সমাজের জন্য বিপজ্জনক। যেমন— অপরাধমূলক ও যৌন আবেদনপূর্ণ সিনেমা তরুণ ও বয়স্কদের সর্বনাশ করে। এসব দেখে ও পড়ে তারা অতি সহজেই বিপদগামী হয় এবং তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার ভাব জাগরিত হয়। এই জন্যেই আমরা পথে ঘাটে ছোটদের মুখে ভালো কথার চেয়ে লাড়ে লাপ্পা বেশি শুনি আর ভালো ব্যবহারের বদলে পাই বোম্বের ছবি-সুলভ হঠকারিতা।[৪২] এক্ষেত্রে এ সমস্যার সমাধানও 'বেগম' বাত্‌লে দিয়েছে এভাবে—

> *যে সব ছবি ছেলেমেয়েরা দেখতে চায় তা আগে নিজেরা কেউ দেখে এসে তবেই বিচার করতে হবে তাদের অনুমতি দেওয়া যায় কিনা। দ্বিতীয়তঃ দেশব্যাপী আন্দোলনের সাহায্যে প্রডিউসারদের বাধ্য করতে হবে ছেলেমেয়েদের উপযোগী ছবি তৈরী করতে। এটা অবশ্য তাঁদেরই নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু দায়িত্ব না বুঝলে দরকার হলে যে কোন উপায়ে তাদের বাধ্য করা প্রয়োজন। এক কথায় শিল্পরুচি বিবর্জিত সস্তা যৌন আবেদন সরবরাহকেই যারা মোটা লাভের একমাত্র পথ হিসেবে আঁকড়ে ধরেছেন, তাঁদের সেই জাতীয় হত্যা কার্যের কবল থেকে দেশের ভবিষ্যৎ জাতিকে বাঁচাতে হবে।*[৪৩]

বাঙালির সংস্কৃতিচিন্তার তথ্যানুসন্ধান করতে গেলে অবশ্যম্ভাবীভাবে সংস্কৃতির যে উপাদানটি সামনে আসে তা হলো তার ভাষা। ভাষা হলো সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় উপাদান। ভাষা শুধু কথাবার্তা ও আলাপের মাধ্যম নয় বরং ভাষার সঙ্গে জড়িত থাকে সমগ্র জাতির অস্তিত্ব। মূলত মাতৃভাষার উৎকর্ষ ব্যতীত কোনও জাতিই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। ফলস্বরূপ ভাষাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন তা সর্বতোরূপেই একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন; যদিও পূর্ব পাকিস্তানের

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কখনোই রাজনৈতিক পরিচয়হীন ছিল না। বরং এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিচয় সব সময়ই ছিল এবং তার সঙ্গে যুক্ত ছিল সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন।[৪৪] পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা জোর দিয়ে বলা হলেও এর সঙ্গে যে ভাষা ওতোপ্রতোভাবে জড়িত সে-বিষয়ে গভীরভাবে কেউই ভাবেন নি। এজন্যই স্বাধীনতা আন্দোলনের পর বহু জটিল প্রশ্নের সঙ্গে ভাষার প্রশ্নও উত্থাপিত হলো এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের বিবেচনায় আপাত সমাধান হিসেবেই উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপিত হয়। এই দাবি অনেকাংশে সমর্থিতও হয়। 'বেগম' এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেনি বরং এ দাবি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে মন্তব্য করে—

> *তা যদি হয় তবে তা অস্বাভাবিক হবে না, কেননা পাশ্চাত্যের কয়েকটি রাষ্ট্রে একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হয়েছে। পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থায় এরূপ নিয়ম করতে হবে যে, পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা একটি বাধ্যতামূলক শিক্ষণীয় ভাষা হবে। এতেই উভয় পাকের মধ্যে অন্তরের সংযোগ দৃঢ়তর হবে। সমগ্র পাকিস্তানে বাংলা বা উর্দু কোন ভাষাকেই এককভাবে রাষ্ট্রভাষা করা সমর্থন করা যায় না।*[৪৫]

কিন্তু রাষ্ট্রভাষা সমস্যার সমাধান এত সহজ নয়। দুটো ভাষা নয়— সমগ্র পাকিস্তানে উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কতকগুলো সরকারি প্ররোচণার মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। এগুলির মধ্যে আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাবই সর্বপ্রধান। অতিশীঘ্রই এ-প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করে। 'বেগম'-এ বলা হয়—

> *আমাদের শিক্ষাবিভাগ বহুদিন পরে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে মুষিক প্রসব করেছেন। মুসলিম শিশুরা তাদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করবে আরবী হরফ শিক্ষার মধ্য দিয়ে। পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, আজকের কোন রাষ্ট্রে কোন দেশেই এ-ধরনের উদ্ভট পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি যে, মাতৃভাষা বাদ দিয়ে বিদেশী ভাষার হরফের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। রাতারাতি যারা পূর্ব বাংলার শ্যামল প্রান্তরের স্থানে মরু আরবের খেজুর বীথির হিল্লোল নিয়ে আসতে চান, তাঁদের কল্পনাশক্তির উর্বরতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই কিন্তু তাঁদের বাস্তব অসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি যে হাসি ও সমবেদনার খোরাক জাগায় এটা তারা কি করে ভুলে যাচ্ছেন। জাতির ও সমাজের মূল বুনিয়াদের আগায় এভাবে কুড়াল মারতে দেশবাসী কখনও দিবে না।*[৪৬]

এভাবে একে একে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা ভাষার বিকাশ রুদ্ধ করার পরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এ ব্যবস্থাসমূহের দ্বারা বাংলা ভাষার উন্নতি তো ব্যহত হলোই উপরন্তু বাঙালির ভাত-কাপড়ের প্রশ্নও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লো। কারণ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা যদি তার স্বীকৃতি না পায় তাহলে সকল সরকারি কাজকর্মই চলবে উর্দুর মাধ্যমে। ফলে একটি আধা বিদেশী ভাষা তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে শিখতে হবে শুধু জীবিকার্জনের তাগিদে। এতে করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে তাদের এক অন্যায় প্রতিযোগিতায় নামতে হবে যার পরিণতি ক্ষতিকর বৈ অন্য কিছু নয়। ফলে বাঙালি অনিবার্যভাবে অবতীর্ণ হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে। এই আন্দোলন

Dhaka University Institutional Repository

তীব্রতা পায় যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র নির্ধারিত হবার পূর্বেই পল্টন ময়দানে ঘোষণা দেন 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে'। এ প্রসঙ্গে 'বেগম'-এ উল্লেখিত হয়—

> *আমরা যতদূর জানি পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার কাজ এখনও চলছে। পাকিস্তানের শাসন পদ্ধতি, ভাষা প্রভৃতি কি হবে তা জনমত দ্বারাই স্থির হবে। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে পূর্বেই কোন কিছু বলা বা জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়া শুধু অসঙ্গত নয়, অগণতান্ত্রিকও বটে। পাঁচ কোটি মানুষের মুখের ভাষাকে বদলাবার যে কোন যুক্তিই থাক, কারও কোন অধিকার নেই। মাতৃভাষা ছাড়া কোন জাতির বাঁচা বা উন্নতি সম্ভব নয় এবং এ জীবন মরণ প্রশ্ন সম্পর্কে জাতি নীরবও থাকতে পারে না।*[৪৭]

আন্দোলন তীব্রতা লাভ করলে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণের আন্দোলন প্রতিহত করার চেষ্টা করে। 'বেগম'-এ তীব্র ভাষায় এই ঘটনার মাধ্যমে নিন্দা জানানো হয়—

> *পুলিশ গুলিতে নিহত মৃতদেহগুলো সরিয়ে নিয়ে কোথাও নষ্ট করে ফেলেছে, এ-সাংবাদটি এত মর্মান্তিক যে, একে প্রতিবাদ করার সামর্থ্য আমার নেই। কোন জাতীয় সরকার দেশবাসীকে ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা এবং ভাষার মতো ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্য কোন আন্দোলন করার অপরাধে অবিচারে গুলিবর্ষণ করেছে এমন নজির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অল্প। কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণ তাদের উপনিবেশের স্বার্থরক্ষার জন্যই এমন বেপরোয়া ও জঘন্য প্রতিবিধান গ্রহণ করতে পারেন।*[৪৮]

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের পর পাকিস্তান সরকার উর্দু ও বাংলাকে পাকিস্তানের official language বা সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করে। এর মধ্য দিয়ে শাসকগোষ্ঠী বাঙালির ভাষা সংক্রান্ত দাবি মেনে নেয়া হয়েছে এরূপ মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করে। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার দাবি আর সরকারি ভাষা দুটো যে একই বিষয় নয় বরং শাসকচক্রের এক ধরনের কূটকৌশল মাত্র অচিরেই 'বেগম' পত্রিকা তা ব্যাখ্যা করে শুভংকরের ফাঁকি ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়—

> *প্রথমেই লক্ষ্য করা দরকার, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে নয়, সরকারী ভাষারূপে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সরকারী ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা এক কথা নয়। শাসনযন্ত্র বা Administration-এর সুবিধার্থে শাসকশ্রেণী এ-ধরনের ভাষা গ্রহণ করে থাকেন। ইংরেজ আমলে শাসনযন্ত্রের সুবিধার জন্যেই ফার্সীকে সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সরকারী ভাষা পরিবর্তন করা চলে এবং তারা তা করেছিলেনও। কিন্তু একবার কোন ভাষাকে শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করলে তাকে পরিবর্তন করা সহজ নয়। দ্বিতীয়তঃ ২০ বছরের জন্য ইংরেজিকে চালু রাখার সিদ্ধান্ত। এ-সিদ্ধান্ত দ্বারা মূলত ভাষার প্রশ্নে বিলম্বিত নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ দীর্ঘ সময় নিয়ে জনগণকে ভাষার দাবী থেকে সরিয়ে নেওয়ার একটা সুচতুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে মাত্র।*

Dhaka University Institutional Repository

> *তৃতীয়তঃ সিন্ধি ও আরবী ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করা সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য কমিটি গঠন। এ-সম্পর্কে অন্য কোন কথা না বলে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের ভাষার মর্যাদা লাভের দাবীকে আমরা অসম্মান করি না, কিন্তু তা যখন বাংলা ভাষার দাবীকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তখন দেশপ্রেমিক মাত্রই ক্ষুব্ধ না হয়ে পারেন না।*[৪৯]

আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক অর্থে এ আন্দোলন অনেকাংশে সফল হলেও সাংস্কৃতিক অর্থে পুরোমাত্রায় সাফল্যলাভ সম্ভব হয়নি। কারণ রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা গৃহীত হলেও ভাষা হিসাবে বাংলা কোনস্থানেই পূর্বাপেক্ষা অধিকতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এমনকি শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও তার প্রগতি তেমন কিছু নয়। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার বিকল্প নেই। 'বেগম' মনে করে—

> *শিক্ষার মাধ্যম নিরূপণের প্রশ্ন বহু পুরাতন। বৃটিশ আমলে আমলাতান্ত্রিক শাসনযন্ত্র চালু রাখার জন্য ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তাহা দেশবাসীর প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে সহায়ক নয়। সেই শিক্ষা প্রজ্ঞার আলোকে জীবনকে উদ্ভাসিত করে নাই, উঁচু দরের কেরানী সৃষ্টি করেছে মাত্র। বিদেশী ভাষার সাথে নিবিড় যোগাযোগ না থাকার ফলে শিক্ষার্থীরা যেমন উহার অন্তর্নিহিত ভাবকে হৃদয়ংগম করতে পারে না, তেমনি অধীত বিষয়গুলিও উক্ত ভাষায় যথার্থরূপে প্রকাশ করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কষ্টকর হয়ে পড়ে। ফলে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে বিদ্যার্জনের দীর্ঘ দিনব্যাপী কসরৎ পরোক্ষভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই অসম্পূর্ণতাকে দূরীভুত করার একমাত্র পন্থা হচ্ছে মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বপ্রকার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন। শিক্ষাকে জীবনে রূপায়িত করতে পারে একমাত্র মাতৃভাষাই— এ সম্পর্কে তর্ক বা সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই।*[৫০]

শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা লাভ করেও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাংলাভাষা তার পুরো অধিকার ফিরে পায়নি দীর্ঘ সময়। গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এহেন দীর্ঘসূত্রিতার বিরোধিতা করে 'বেগম'-এ বলা হয়—

> *কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগে ও কার্যবিবরণীতে উর্দুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাকেও যেভাবে গ্রহণ করার কথা ছিল শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পর আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। ডাক, তার, রেলওয়ে, বেতার প্রভৃতি বিভাগে ইচ্ছাকৃতভাবেই এখনো বাংলাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। এর কারণ হিসাবে কেউ কেউ বাংলাকে হিন্দুর সৃষ্টি বলে অভিযোগ করে থাকেন, বাংলাকে হিন্দু, খৃষ্টান অথবা মুসলমানদের সৃষ্ট ভাষা হিসেবে না দেখে প্রকৃতপক্ষে একে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের ভাষারূপেই দেখতে হবে। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠদের ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা না দিলে পাকিস্তানের মূল ভিত্তিকে অস্বীকার করা হবে।*[৫১]

বাস্তবিকপক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাষা মর্যাদা লাভ করলেও এ ভাষাকে এবং এ ভাষা যে সংস্কৃতির বাহন তার বিকাশকে রুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র দীর্ঘদিনের। আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে কীভাবে তথাকথিত হিন্দু বাংলা থেকে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বাংলায় রূপান্তরিত করা চলে তার জন্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল মহলের চেষ্টার অন্ত নেই। যে কোনও ভাষার মধ্যে বিদেশী শব্দ অনেক থাকে এ প্রক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক এবং এ প্রক্রিয়া একটি জাতির ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু মুসলিম বাংলার নামে সংস্কৃত উদ্ভূত শব্দসমূহকে হিন্দু শব্দ বলে বর্জন করে সেস্থানে আরবি-ফারসি শব্দের প্রচলনের চেষ্টা প্রহসন ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না।

বাংলাভাষার প্রতি তীব্র পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও 'বেগম' ভাষাভিত্তিক বন্ধুত্বেও বিশ্বাসী ছিল। অর্থাৎ ভাষাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যে বিভেদ তা পুরোপুরি 'বেগম' মেনে নেয়নি। তাই বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় আসীন রেখে এবং উর্দুকে পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে রেখে উভয় অংশে উভয় ভাষার চর্চা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে বাংলার পাশাপাশি উর্দু শিক্ষার প্রচলন করা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা শিক্ষার প্রচলন করা। এতে করে উভয় অংশে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষা প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করবে না বরং এক ধরনের বন্ধুত্বের অবতারণা করবে বলে 'বেগম'-এ মত প্রকাশ করা হয়। তবে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলার দাবিকে 'বেগম' কখনোই অস্বীকার করে নি বরং জোর গলায় তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে এবং বাংলার মর্যাদা আদায়ে সর্বদাই সচেষ্ট ছিল। যেমন—

> *বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মর্যাদা পেয়েছে সত্য কিন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে যে, এখনও পর্যন্ত সরকারী অফিসে বাংলা তার যথাযোগ্য আসন পায় নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, করাচী রেডিও থেকে শতকরা দেড় ভাগ প্রোগ্রাম মাত্র বাংলায় প্রচারিত হয়, ঢাকা ছাড়া রেডিও পাকিস্তানের অন্যান্য কেন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষাপর্যায়ে উর্দুকে অবশ্যপাঠ্য বিষয় করা হলেও, পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে বাংলাকে অবশ্যপাঠ্য হিসাবে এখনো স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।*[৫২]

শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষাকে মাধ্যম হিসেবে প্রচলনের জন্য ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট কমিটি গঠনপূর্বক বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[৫৩] তবে এক্ষেত্রে বাংলাভাষায় প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের অভাব থাকায় এ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। এমন মতই প্রকাশ করেছে সাপ্তাহিক 'বেগম'—

> *এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলাভাষায় প্রয়োজনীয় বইপুস্তকের ব্যবস্থা করা। এ-কাজটি সহজ নয়। বিশেষতঃ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব সম্পাদনে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, উচ্চশিক্ষার মানের যেন কোন অবনতি না ঘটে।*[৫৪]

বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে 'বাংলা প্রচলন সমিতি' গঠন করা হয়। এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে বাংলা যাতে সম্পূর্ণ দায়িত্বভার

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করতে পারে, তার জন্যে ভাষাকে প্রস্তুত করা। বাংলা ভাষার প্রচলন সম্পর্কে এই সমিতির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনেকটা এইরূপ—

> *শিক্ষাকে যথার্থ ফলপ্রসূ এবং সমাজের সকল শ্রেণীর পক্ষে সহজলভ্য করার জন্য মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু তা একটি উপায় মাত্র, লক্ষ্য নয়। মাধ্যম হিসেবে বাংলা গৃহীত ও প্রচলিত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে কোন আকস্মিক ও বৈপ্লবিক উন্নতি আপনা আপনি সংঘটিত হয়ে যাবে এমন নয়। মনে রাখতে হবে যে, দেশের অধিকাংশ লোক এমনকি বাংলা ভাষাও পড়তে বা লিখতে পারে না। বস্তুতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাকে প্রচলিত করা আমাদের শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপকতর আন্দোলনের একটি অংশ মাত্র।*[৫৫]

ভাষা, শিক্ষা, রাজনীতি কিংবা ধর্ম, জীবনযাপন ইত্যাদি সবকিছুই যেমন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের বিষয় একই সঙ্গে তা আবার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেরও বিষয়। শুধু সাংস্কৃতিক বলয়ে আবৃত করে এদের আলোচনা একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধানের উদ্দেশ্যেই করা এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে একে অপূর্ণ ইতিহাস চর্চা বলা যাবে না। সাংস্কৃতিক বলয়ের ভিতরে থেকে শিক্ষা, রাজনীতি, ভাষা, সৌন্দর্যচর্চা কিংবা নারী-পুরুষের সমানাধিকার বিষয় সম্পর্কে বিভাগ পরবর্তী মুসলিম নারীমানসের ভাবনাচিন্তার অনুসন্ধানে সাময়িক পত্রিকা হিসেবে 'বেগম'-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নারীদের জন্য এবং নারীদের দ্বারা পরিচালিত বিশেষায়িত এই পত্রিকাটি উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে, সেই সময়ের পিছিয়ে পড়া নারী-সমাজকে দিক নির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে অনেক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে এ কথা নিশ্চিতই বলা যায়।

তথ্যসংকেত

১. *বদরুদ্দীন উমর, সাংস্কৃতির সংকট, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১৫*
২. *প্রাগুক্ত।*
৩. *সোনিয়া নিশাত আমিন, নারী ও সমাজ, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), তৃতীয় খণ্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৭৬*
৪. *প্রাগুক্ত।*
৫. *বেগম, ১১শ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯, পৃ. ৩*
৬. *মুসলিম সংখ্যা ও নারী, বেগম, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯, পৃ. ৩*
৭. *সোনিয়া নিশাত আমিন, প্রাগুক্ত।*
৮. *নারীর মর্যাদা, সাপ্তাহিক বেগম, ৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬ই মার্চ, ১৯৫৫, পৃ. ৩*
৯. *আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, সাপ্তাহিক বেগম, ৭ম বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪*
১০. *সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক বেগম , ১৮ শ বর্ষ, ১৮ শ সংখ্যা, ২রা মে, ১৯৬৫*
১১. *আমাদের শিক্ষা, সাপ্তাহিক বেগম, ৭ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৬ই এপ্রিল, ১৯৫২, পৃ. ৩*
১২. *আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা, সাপ্তাহিক বেগম, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬১, পৃ. ৩*

Dhaka University Institutional Repository

১৩. *সাপ্তাহিক বেগম, প্রথমবর্ষ ৩১ সংখ্যা, ২১ মার্চ, ১৯৪৮, পৃ. ৩*
১৪. *শিক্ষাক্ষেত্রে খামখেয়ালি, সাপ্তাহিক বেগম, ৫মবর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩০শে মার্চ, ১৯৫২, পৃ. ৩*
১৫. *সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক বেগম , ২০শ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭*
১৬. *শিক্ষাক্ষেত্রে খামখেয়ালী, সাপ্তাহিক বেগম, ৫ম বর্ষ, ১০সংখ্যা, ৩০শে মার্চ, ১৯৫২, পৃ. ৩*
১৭. *ভিকারুন্নেসা গার্লস স্কুল, সাপ্তাহিক বেগম, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮ই মার্চ, ১৯৫৩, পৃ. ৩*
১৮. *সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক বেগম , ২১শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ২১শে জানুয়ারি, ১৯৬৪*
১৯. *সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ২১ মার্চ, ১৯৪৮, পৃ. ৩*
২০. *নার্সিং বৃত্তির প্রসার, সাপ্তাহিক বেগম, ১২শ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, ১৭ই মে, ১৯৫৯, পৃ. ৩*
২১. *সোনিয়া নিশাত আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০২*
২২. *নারীজাগরণ, সাপ্তাহিক বেগম, ১০ই অক্টোবর, ১৯৪৮*
২৩. *সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক বেগম , ২০শ বর্ষ ৩২শ সংখ্যা, ৯ই জুলাই, ১৯৬৭*
২৪. *তাহমিনা আলম, বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারীসমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২১*
২৫. *সোনিয়া নিশাত আমিন, প্রাগুক্ত।*
২৬. *নারী ও রাজনীতি, সাপ্তাহিক বেগম, ২০শে মার্চ, ১৯৪৯, ২৮শ সংখ্যা, পৃ. ৩*
২৭. *আগামী নির্বাচন ও মহিলা আসন, ৪র্থ বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা, ১৮ই নভেম্বর ১৯৫১, পৃ. ৩*
২৮. *সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক বেগম, ২১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৭৬, পৃ. ৩*
২৯. *স্যার আবদুর রহমানের ঘোষণা, সাপ্তাহিক বেগম, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, ২৪শে মে, ১৯৫৩, পৃ. ৩*
৩০. *প্রাগুক্ত।*
৩১. *বহুবিবাহ প্রসঙ্গে, সাপ্তাহিক বেগম, ১২ই ডিসেম্বর ১৯৫৪, পৃ. ৩*
৩২. *প্রাগুক্ত।*
৩৩. *বিবাহে যৌতুক গ্রহণ, সাপ্তাহিক বেগম, ৮ম বর্ষ ৪২তম সংখ্যা ১লা জানুয়ারি ১৯৫৬, পৃ. ৩*
৩৪. *সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ২রা মে, ১৯৪৮, পৃ. ৩*
৩৫. *সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক 'বেগম' , ২১শ বর্ষ ৪৭শ সংখ্যা, ২০শে অক্টোবর, ১৯৬৮*
৩৬. *সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ২রা মে, ১৯৪৮, পৃ. ৩*
৩৭. *রূপচর্চা, সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ ৩১তম সংখ্যা, ২১ মার্চ ১৯৪৮, পৃ. ৩*
৩৮. *সৌন্দর্যচর্চা, সাপ্তাহিক বেগম, ২য় বর্ষ ১৫তম সংখ্যা, ১২ই ডিসেম্বর ১৯৪৮, পৃ. ৩*
৩৯. *সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ২১ মার্চ ১৯৪৮, পৃ. ৩*
৪০. *বিশ্ব সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা, সাপ্তাহিক বেগম, ৫ম বর্ষ ২২তম সংখ্যা, ১৩ই জুলাই, ১৯৫২, পৃ. ৩*
৪১. *নৈতিক স্বাস্থ্য, সাপ্তাহিক বেগম, ২৯শে আগস্ট, ১৯৫৪, ২৩তম সংখ্যা*
৪২. *সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক বেগম , ১৯ বর্ষ ২৭ সংখ্যা, ১৯ শে জুন ১৯৬৬, পৃ. ৩*
৪৩. *ছায়াছবি, সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ ৪২তম সংখ্যা, ৬ই জুন ১৯৪৮, পৃ. ৩*
৪৪. *বদরুদ্দীন উমর, একুশে ফেব্রুয়ারি ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ : সংস্কৃতির সংকট, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৭৮*
৪৫. *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, সাপ্তাহিক বেগম, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১০ই আগস্ট ১৯৪৭, পৃ. ৩*
৪৬. *আরবী হরফে বাংলা ভাষা, সাপ্তাহিক বেগম, ৪র্থ বর্ষ ৩৯তম সংখ্যা ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫১*
৪৭. *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, সাপ্তাহিক বেগম, ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, পৃ. ৩*
৪৮. *প্রাগুক্ত।*
৪৯. *রাষ্ট্রভাষা নয় সরকারী ভাষা, সাপ্তাহিক বেগম, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৫৪,৭ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, পৃ. ৩*
৫০. *শিক্ষার মাধ্যম, ৭ম বর্ষ ২০শ সংখ্যা।*
৫১. *বাংলা ভাষার মর্যাদা, ৯ম বর্ষ ২৪শ সংখ্যা, ১৯শে আগস্ট, ১৯৫৬*
৫২. *প্রাগুক্ত।*
৫৩. *সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক বেগম , ১৮ শ বর্ষ ১২ শ সংখ্যা, ১৪ই মার্চ, ১৯৬৫, পৃ. ৩*
৫৪. *সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক বেগম , ১৮শ বর্ষ ১৪ শ সংখ্যা, ২৮ শে মার্চ ১৯৬৫, পৃ. ৩*
৫৫. *সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক বেগম , ১৮শ বর্ষ ১৪ শ সংখ্যা ২৮ শে মার্চ ১৯৬৫, পৃ. ৩*

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

'বেগম' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ : সমাজ ও সংস্কৃতিচিন্তা

ভারতীয় নারীর মর্যাদার কালক্রমিক পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণীতে।[১] যেমন প্রাচীন ভারতে নারী যথেষ্ট উঁচু মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং বৈদিক যুগের পরে এই অবস্থানের অবনতি ঘটে। তখন মনে করা হতো— জীবনের কোনও পর্যায়েই নারীর জন্য কোনও স্বাধীনতা থাকতে পারে না।[২] এই অবস্থা মুসলিম বা মধ্যযুগ পর্যন্ত চলতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের হিন্দুসমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এবং ইংরেজ সরকার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে নিজেদের সার্বিক উন্নতি সাধনের পাশাপাশি নারীসমাজের সার্বিক কল্যাণের জন্য এগিয়ে আসেন। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) প্রমুখ ব্যক্তির ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় হিন্দু নারীসমাজের অধঃপতিত অবস্থার কিছুটা উন্নতি সাধিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ভারতীয় তথা বাঙালি মুসলিম সমাজেরও উন্নতি ঘটে। এসময় ইংরেজ সরকার মুসলিম সমাজের উন্নতিতে কিছুটা মনোযোগী হয়— পাশাপাশি নওয়াব আব্দুল লতীফ (১৮২৬-১৮৯৩), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৯) প্রমুখ ব্যক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ও প্রচারের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু মুসলিম সমাজের উন্নতিতে তাঁরা মনোযোগী থাকলেও পাশাপাশি অবরুদ্ধ নারীসমাজকে নিয়ে তাঁরা বিশেষ ভাবনা চিন্তা করেননি।[৩] অবশ্য সৈয়দ আমীর আলী ইসলামের মর্মবাণীর আলোকে মুসলিম নারীর প্রাপ্য ও ন্যায্য অধিকারের কথা বলেছেন; তবে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি সমাজকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারেননি।[৪]

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই বাঙালি মুসলিম সমাজের সচেতন ও বিদ্যোৎসাহী অংশ নারী মুক্তির প্রয়োজন উপলব্ধি করেন এবং তাঁরা বিভিন্ন লেখনী ও বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে নারীদের এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তাঁরা নারীর কল্যাণ এবং এর মধ্য দিয়ে সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের উপায় বাৎলে দেন। বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ এমনকি কবিতার মধ্য দিয়ে আর সব সাময়িকপত্রের পাশাপাশি 'বেগম'ও এক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আন্দোলনের সময় আন্দোলনের মূলভিত্তি হিসেবে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও বন্ধনকে ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু এই ধর্ম আসলে কী? ধর্মীয় বিশ্বাস কী— এটা নিয়ে সুস্পষ্ট কোনও বোধ প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী থেকে শুরু করে আপামর জনসাধারণ কারো মধ্যেই সেভাবে ছিল না। কেউ ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের অর্থ মনে করলো কোর্মা পোলাও এবং গরু খাওয়ার স্বাধীনতা, কেউ ভাবলো বাংলা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আরবি বা ফারসি ভাষা চর্চার স্বাধীনতা, কেউ ভাবলো বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করে তাঁদের স্থলে ইকবাল, আলাওল, কায়কোবাদকে অভিষিক্ত করা।[৫] স্বাধীনতা সম্পর্কে এবং তার পাশাপাশি ধর্ম সম্পর্কে স্বচ্ছ কোনও ধারণা না থাকার কারণেই নারীদের অবস্থান ও মর্যাদা নিয়েও ভুল বোঝাবুঝি এবং ভুল আচরণের অবকাশ তৈরি হয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীকে অন্তঃপুরে বন্দী করে রাখার প্রক্রিয়া নতুন করে শুরু হয়। উদাহরণ দিয়ে রেবেকা সুলতানা চৌধুরী 'নারীর আজাদী ও মুসলমান সমাজ' শীর্ষক নিবন্ধে বলেন—

> *বস্তুত এক শ্রেণীর লোক মনে করে যে পাকিস্তান শুধু পুরুষের জন্যেই। বৃটিশ আমলে মেয়েদের যেটুকু সুবিধা ছিল পাকিস্তান পাওয়ার সাথে সাথে তাও অন্তর্হিত হতে চলেছে। রাস্তা ঘাটে, সিনেমা হলে, ট্রামে বাসে ও পার্কে সর্বত্রই ভোগ করতে হচ্ছে মেয়েদেরকে অনেক রকম অসুবিধা। এইসব ভদ্র মেয়েদেরকে লক্ষ্য করে একশ্রেণীর লোক যে রকম অশ্লীল উক্তি ও অঙ্গভঙ্গি করে তাতে সুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই ঘৃণার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। যে কোন স্বাধীন দেশের লোকের পক্ষে এর চাইতে লজ্জার বিষয় আর কি হতে পারে।*[৬]

এরূপ মানসিকতার প্রতিবাদ করে তিনি বলেন—

> *আজ পাকিস্তান অর্জনে একশ্রেণীর লোক নারীদেরকে শতাব্দীর অন্তরালে ঠেলে দিয়ে 'পুলছিরাতের' পথ খোলসা করবার জন্যে স্বতঃই উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। তাঁরা মনে করেন ইসলামিক ঐতিহ্য ও শরীয়তকে বজায় রাখতে হলে নারীকে অবরোধ করতে হবে। কিন্তু নারীকে বাদ দিয়ে ইসলাম তার ঐতিহ্য বজায় রাখতে বলেনি। বিদ্যান্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর প্রতি ফরজ (মাজা ও বয়হাকী)–এর অর্থ এই নয় যে, অবরুদ্ধ হয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে। লেখা পড়া শিখতে হলে প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করতে হলে নারীকেও বাইরে যেতে হবে। তাদের এই ধারণা দূর করতে হলে নারীকে আজ মুক্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে প্রচার করতে হবে যে, পাকিস্তান এনেছে যতটুকু আজাদী পুরুষের, ততটুকু আজাদী নারীদেরও।*[৭]

লেখিকা 'বেগম'-এর আর একটি সংখ্যায় নারী-পুরুষের সমান অধিকারের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এবং সমঅধিকারের জোর দাবি উপস্থাপন করেছেন–

> *এই বিংশ শতাব্দীতে আজাদী হাছেল হওয়ার পরেও মেয়েদের শিক্ষা, জ্ঞান ও স্বাস্থ্যচর্চা পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃতি লাভ করেনি। এখনো গ্রামে হাজারে ৯৯৮ জন মহিলা অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত। পারিবারিক জীবনে নেই এদের কোন অধিকার। ভোর ৪টা হতে গভীর রাত পর্যন্ত খেটেও তারা পরিবারের সম্পদের অধিকারী নয়— স্বামীর, পুত্রের,*

Dhaka University Institutional Repository

দেবর-ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্রের গলগ্রহমাত্র। তালাকের ঘূর্ণিহাওয়ায় গৃহ হতে গৃহান্তরে হয় বিতাড়িত। প্রহারের অত্যাচারে শরীর হয় তাদের জর্জরিত। গৃহপালিত পশুর প্রতি মানুষ যতটা মমতা দেখায়, ততটুকু মমতারও অভাব হয় তাদের প্রতি অনেক ক্ষেত্রে। কিসে হবে এ-অবস্থার উন্নতি? মিনতিতে, অশ্রুজলে, পুরুষের অত্যাচারকে 'হাকিম' বলে মেনে নিলে? তা নিশ্চয় নয়। এ-অবস্থার উন্নতি করতে হলে নারীকে ফিরে আসতে হবে নিজ সম্বিতে। তাদের মধ্যে জ্ঞান, চেতনা, মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। এ-অত্যাচার প্রতিরোধ করলেই পুরুষদের মধ্যে জেগে উঠবে সম্বিত— নারীর প্রতি মর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ।[৮]

সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ, জাতিকে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যার মোকাবেলায় সর্বাগ্রে প্রয়োজন নারী ও পুরুষের সমান দায়িত্ব সচেতনতা। ইতিহাসের শুরুতেই মানব সমাজে এই দায়িত্ববোধ পরিলক্ষিত হয়। যদিও সময়, পরিবেশ ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে দায়িত্ব সচেতনতার কমবেশী তারতম্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মুখ্যত নারী কখনও তার দায়িত্ব থেকে বিস্মৃত হয়নি কিংবা সে-দায়িত্বকে এড়িয়ে চলার প্রয়াস পায়নি। বরং মানব সভ্যতার ঊষালগ্নে জীবন ও জীবিকার স্বার্থে পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে এবং কখনও কখনও বেশি মাত্রাতেই কায়িক পরিশ্রমের কাজ নারী করছে। কিন্তু ধীরে ধীরে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠায় নারী ও পুরুষের দায়িত্ববোধ ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। তখন দেশ ও জাতির স্বার্থে পুরুষ দায়িত্ব নিল যুদ্ধবিগ্রহে যাবার, আর সন্তান পালন ও গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করল নারী। তৈরি হলো শ্রমবিভাগ। এবং এই শ্রমবিভাগই নারীকে ক্রমশ দুর্বল করে তুললো। মিরাতুল ফাতেমার 'সমাজ বিবর্তন ও নারীর জীবিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ের ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়েছে এভাবে—

শ্রমবিভাগই নারীকে ক্রমশঃ দুর্বল করে তুললো। এতে বহির্জগতের সাথে নারীর সম্পর্ক ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগলো। নারী হারালো তার মুক্ত স্বাধীন মন, আর দেহের শক্তি। সব শক্তিই চর্চা সাপেক্ষ— তা সে দৈহিকই হোক আর মানসিকই হোক। শক্তি মাত্রই অনুশীলনে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। যেদিন থেকে নারী দৈহিক শক্তির অনুশীলন থেকে বিরত হলো সেদিন থেকেই তার জীবনের স্বাধীনতা আর জীবিকার স্বাধীনতা ক্রমশঃ ক্ষুণ্ন হতে লাগলো।[৯]

নারীর সমঅধিকারের অর্থ— পুরুষের যেমন আছে তাদের নিজস্ব জীবন ধারা, পৌরুষ ও প্রতিভা বিকাশের পূর্ণ সুযোগ, তেমনি নারীরও থাকবে তাদের প্রতিভা, পূর্ণ নারীত্ব ও মাতৃত্বকে— স্বাস্থ্যে, জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে বিকশিত করে তুলবার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা। কিন্তু নারীমুক্তি বা নারী-পুরুষ সমানাধিকার যাই বলা হোক না কেন এর সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি। বস্তুত নারীর সর্বাগ্রে প্রয়োজন তার অর্থনৈতিক মুক্তি। মায়া গুপ্তা নারীর এই অর্থনৈতিক মুক্তির ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন—

সবচেয়ে বড় কথা হলো অর্থনৈতিক মুক্তি, তারপর অন্যান্য— যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তি। রাজনৈতিক বা সামাজিক মুক্তির উপর অর্থনৈতিক মুক্তি সম্পূর্ণরূপে না হলেও অনেকাংশে নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক মুক্তি যদি না পাওয়া যায় তবে রাজনৈতিক বা সামাজিক মুক্তির মূল্য খুব

Dhaka University Institutional Repository

সামান্যই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে 'দেবী' 'দাসী'তে পরিণত হয়। আজীবন অন্যের উপর নির্ভর করতে হয় বলে প্রত্যেক নারীকেই নানা অসম্মানের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করতে হয়।[১০]

প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত নারীদের মুক্তির বাধা হচ্ছে অর্থনৈতিক পরাধীনতা। শ্রমিক নারীদের অর্থনৈতিক পরাধীনতা নেই কিন্তু তারা সামাজিক পরাধীনতায় নিপীড়িত। তবে শ্রমিক শ্রেণীর নারীগণ মধ্যবিত্ত নারীদের তুলনায় স্বাধীন। শ্রমিক নারীরা কৃষিকার্য এবং অন্যান্য ব্যাপারে পুরুষদের অংশীদার হয়ে জীবিকা অর্জন করতে পারে। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীগণ তা পারেন না। এই শ্রেণীর পুরুষেরা নারীদের জীবিকার্জনের কথা ভাবতে পারেন না। তাঁরা ভাবতেও পারেন না যে, সংসারের বাইরে পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করা সম্মান এবং গৌরবের।

নারী-স্বাধীনতা কিংবা নারী-মুক্তির মধ্যে যেন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না থাকে, এমনকি নারীদের মধ্যেও না, সে-বিষয়ে লেখিকারা ছিলেন সচেতন। নারী-মুক্তি মানে একা একা চলাফেরা করা বা যা খুশি তা করার স্বাধীনতা নয়। বেগম সুফিয়া কামাল এ-বিষয়ে বলেন –

একা ট্রামে, বাসে চড়ে বেড়াতে যাওয়া, একা সিনেমা দেখাটাই স্বাধীনতা নয়। যোগ্যতা দেখাতে হবে দেশের, সমাজের ও সংসারের সংগঠন ও মেধার মধ্য দিয়ে।[১১]

নারী-মুক্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে পর্দাপ্রথাকে। একথা সর্বজন বিদিত যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সামাজিক কাঠামো দ্বারা সীমিত। এই সামাজিক কাঠামোই পর্দাপ্রথা বা অবরোধপ্রথা বলবৎ করে।[১২] বাংলার নারীদের ক্ষেত্রে এই পর্দাপ্রথার বেড়াজাল ছিল অনেক কঠোর। বিভিন্ন দেশের মেয়েরা যখন বিদ্যাশিক্ষা লাভ করে ট্রাম-বাস চালিয়ে অফিস আদালতে কাজ করছে পাকিস্তানি নারী তখন আবদ্ধ চার দেয়ালের ভিতরে। মওলানাদের মনগড়া কিছু সামাজিক প্রথাকে ধর্মীয় পোশাক পরিয়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে নারীদের কাঁধে। হাজেরা খাতুন তাঁর 'মুসলিম নারী ও পর্দাপ্রথা' শীর্ষক নিবন্ধে এই পর্দার প্রকৃতি উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন এভাবে–

ধর্মের বিধান অনুযায়ী মেয়েদের নাকি বাড়ীর বাহির হওয়া নিষেধ, এমনকি বাহিরের ঘরেও আমাদের গলার আওয়াজ অপর লোকে শুনিলে পাপ। গ্রামের কোন মুসলমান ভদ্রলোক যদি মেয়েকে পাঠশালায় দেন তাহা হইলে আমাদের সমাজপতিরা বলেন যে, মেয়েদের আবার লেখাপড়া শিখানো কেন? মেয়েদের বাংলা ইংরাজী শিক্ষা গুনাহ হইবে। মোল্লা মৌলবীদের বলিতে শুনিয়াছি যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে অসচ্চরিত্রা হইয়া যাইবে।[১৩]

কিন্তু ইসলামের দোহাই দিয়ে এরূপ পর্দার অবতারণা করা হলেও তা বাস্তবিকই কতখানি ইসলাম সম্মত সে প্রশ্ন জাগে। 'ইন্ডিয়ান উইমেনস্ জার্নাল' থেকে অনূদিত পর্দাপ্রথা শীর্ষক নিবন্ধটির মধ্যে এ-প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এভাবে–

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম পর্দার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে বটে, কিন্তু ইসলাম সম্মত পর্দাপ্রথা প্রগতি বিরোধী বর্তমান পর্দাপ্রথা নহে। প্রাচ্য জগতে বিশেষতঃ মুসলমানদের মধ্যে যতদিন এই সর্বনাশকর পর্দাপ্রথার অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন প্রাচ্যের তথা মুসলিম জগতের কোন উন্নতিরই আশা নাই। প্রাচ্য জগতের নারীকূলের জন্য ইসলামসঙ্গত পর্দাব্যবস্থাই হইবে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী।[১৪]

পর্দাপ্রথার কুফল সম্পর্কে আর এক স্থানে বলা হয়েছে–

বোরখায় আবৃত রেখে নিজেদের দৈহিক রূপ প্রদর্শন না করার জন্য মেয়েদের প্রতি যে ধর্মীয় অনুশাসন রয়েছে তার অপব্যাখ্যাই এই অবস্থার মূল কারণ। এই অনুশাসনের অর্থ করা হয়েছে যে, মেয়েদেরকে চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হবে এবং অবশিষ্ট পৃথিবীর দৃষ্টির আড়ালে আত্মগোপন করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মেয়েরা শুধু পুরুষদের দৃষ্টির আড়ালেই নয়, এমনকি অপরিচিত মেয়েদেরও দৃষ্টির আড়ালে থাকার জন্য পর্দাপ্রথার পালন করে। এ-অবস্থায় মেয়েদের শিক্ষার কোন গুরুত্বই আর থাকে না এবং অনেক ক্ষেত্রে মেয়ের বাবা মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে আপত্তি করে থাকেন।[১৫]

নারীকে অবরুদ্ধ করে রেখে শুধু নারীকেই বঞ্চিত করা হয় না বরং সমাজও বঞ্চিত হয় অনেক মাত্রায়। কারণ নারী পুরুষকে নিয়েই সমাজ। কাজেই সমাজের একাংশকে পিছনে রেখে আর এক অংশ সামনে এগিয়ে যেতে পারে না বরং টানাপোড়েনে পুরো সমাজদেহই দুর্বল হয়ে পড়ে। সমাজের এ-দিকটি উন্মোচন করে হাজেরা খাতুন বলেন–

নারী আর পুরুষের একত্র প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে সমাজের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। অর্ধাঙ্গের বাতরোগ হইলে যেমন শরীরের অর্ধেকটা অবশ হইয়া যায় সেইরূপ সমাজের অর্ধাঙ্গ স্বরূপ নারীসঙ্ঘকে দূরে সরাইয়া রাখিলে সমাজও দুর্বল হইয়া পড়ে। সকল সভ্য দেশেই পুরুষ ও নারীসমানভাবে কাজ করে, সমঅধিকার প্রাপ্ত হয়, সুযোগ পাইয়া, শিক্ষা পাইয়া সমান শক্তিশালী হয়। কিন্তু আমাদের দেশের জনশক্তি দ্বিধাবিভক্ত। দেশের নারীসঙ্ঘকে জাতি দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। ইহা স্ত্রী স্বাধীনতার যুগ। কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষরা আমাদের কতটুকু স্বাধীনতা দিতেছে? স্বীয় শক্তির বলে অল্পে অল্পে আমরা নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায় করিয়া লইতেছি মাত্র। অনেকে বলেন, নারীজাতির ধর্ম হইতেছে সৃষ্টি ও পালন। কিন্তু সৃষ্টির কাজ নারীরা করিবে বটে তাহা ঘরে থাকিয়া। বাইরে নারী হইবে শক্তিময়ী। ঘরে বাইরে মিল ঘটাইয়া এইরূপে পরম শক্তিশালী সমাজ গঠন করা যায়।[১৬]

নারী তথা সমাজের অগ্রগতিতে শিক্ষার ভূমিকার কথাই যুগে যুগে সকল মনীষী ও চিন্তাবিদগণ সর্বাগ্রে বলে গেছেন। 'বেগম' পত্রিকার বিভিন্ন লেখায় এই একই ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। নারীকে শিক্ষিত করে তোলা ব্যতিরিকে কোনও কল্যাণই সাধিত হতে পারে না – 'বেগম'-এর সকল লেখিকাগণই এই মতবাদ প্রকাশ করেছেন। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও এ-সম্পর্কে করণীয় কী— সে-বিষয়ে 'বেগম'-এ বলা হয়েছে—

Dhaka University Institutional Repository

> *নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পুরুষদের চাইতে কমতো নয়ই বরং এক হিসেবে আরো বেশী। কর্তৃপক্ষের ওপর এই দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজেরা নিশ্চিত থাকলে যে আত্মহত্যা করা হবে সে কথাও আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। শহরের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, গাঁয়ের প্রতি কোনে শিক্ষিতা মেয়েদের এমন কোন চক্র গড়ে তুলতে হবে যেখানে শিক্ষা প্রচারের বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হবে।*[১৭]

একটি পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত সন্তান গড়ে ওঠার পেছনে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। একজন শিক্ষিত মা-ই পারে সন্তানের এইসব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে– এ মতবাদে বিশ্বাসী বেগম মনোয়ারা মাহবুব 'শিক্ষিতা নারীর প্রয়োজন' শীর্ষক নিবন্ধে বলেন–

> *অশিক্ষিতা জননী কিরূপে তাঁহার শিশুকে ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবেন। শিশুর পরিচর্যা, শিশুর স্বাস্থ্য এসবই নির্ভর করে শিক্ষিতা জননীর উপর। সমগ্র সমাজের স্বাস্থ্য ও সম্পদের এক বিরাট অংশ নারীজাতির উপর ন্যস্ত। কিন্তু নারী অশিক্ষিতা হইলে সে তাহার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিতে পারে না। তাহার ফলে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় আসিয়া সকলের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে, তাহাদের উন্নতির সকল আশা ব্যাহত হয়।*[১৮]

ফলস্বরূপ আদর্শ মা গড়ে তোলার জন্যও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বলে অনেকে মনে করেন। খয়রুন্নেছা 'আমাদের শিক্ষা' নিবন্ধে এ-ধরনের বক্তব্যই উপস্থাপন করেছেন–

> *শিক্ষা প্রধানতঃ দুই রকমে দেওয়া যায়। প্রথমত দৃষ্টান্ত দ্বারা, দ্বিতীয়ত উপদেশ দ্বারা। আমরা শিশুকালে প্রথমোক্ত প্রণালী দ্বারা মায়ের নিকট নানা বিষয় শিক্ষালাভ করিয়া থাকি। উপদেশ অপেক্ষা মাতার ব্যবহার শিশুর চরিত্র গঠন বিষয়ে অধিকতর কার্যকরী হয়। অতএব যাহাতে আদর্শ মাতা গড়িয়া তুলিতে পারা যায়, সেই জন্য দেশের সর্বত্র জানানা স্কুল স্থাপিত হওয়া উচিত।*[১৯]

পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার দীর্ঘদিন পরও দেখা যায় নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে জাতি সেরূপ অগ্রসর হতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে নারীপ্রগতি এবং নারীশিক্ষা সম্পর্কে অনেক বেশি কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়াই ছিল এর কারণ। এই কুসংস্কারকে প্রশ্রয়ও দিয়েছিল মুসলিম সমাজ, দেশে ইংরেজ আগমনের অব্যবহিত পরে মুসলিম সমাজ থেকে ধ্বনি তোলা হয়েছিল যে, ইংরেজি কাফেরের ভাষা; কাজেই তা মুসলমানদের পক্ষে হারাম। ফলে মুসলিম সমাজে শিক্ষার হার হলো খুবই নগন্য এবং সমাজের এই পশ্চাৎমুখীনতার বিষক্রিয়া বহুকাল যাবৎ সমাজের ক্ষত হয়ে বিরাজ করেছে। এর ধাক্কা লেগেছে মুসলিম নারীসমাজেও। মাহমুদা খাতুন 'নারীশিক্ষা ও পূর্ব পাকিস্তান' শীর্ষক প্রবন্ধে এ-সম্পর্কে বলেন–

> *শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষদের পশ্চাদবর্তিতাই নারীশিক্ষা সম্পর্কে সমাজ জীবনে কুসংস্কারের বোঝা চাপিয়ে দিলো। মেয়েদেরকে আধুনিক শিক্ষা দান করা হলে সমাজ ঘোরতর পাপের সম্মুখীন হবে– এই অন্ধ বিশ্বাস মানুষের মনে বদ্ধমুল হয়ে গেল। আজাদী লাভের পরও অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত লোকের মন থেকে সেই বিশ্বাস বিদূরিত হওয়ার অবকাশ পায়নি। তার ফলে*

Dhaka University Institutional Repository

> *আজাদীর তিন বৎসর অতিক্রান্ত হবার পরও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে গর্ব করার মতো আমাদের কোন উন্নতি হয় নাই। আজও আমাদের সমাজের বিরাট সংখ্যক মানুষ মেয়েদের শিক্ষিতা করাকে রীতিমতো পাপের কাজ বলেই বিবেচনা করে থাকেন।*[২০]

ধর্মীয় কুসংস্কার ছাড়া দারিদ্র্যও শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। পাকিস্তানের অধিকাংশ নাগরিক দরিদ্র হওয়ার কারণেই শিক্ষার প্রশ্ন তাদের কাছে অবান্তর বলে মনে করেন কাজী জাহান আরা খাতুন। তিনি বলেন–

> *পাকিস্তানের অধিবাসীদের অধিকাংশই দরিদ্র ও নিরক্ষর, স্ত্রীশিক্ষার কথা তাদের কাছে নেহাৎ অবান্তর। শিক্ষার অভাবে তাদের মানসিক রুচি ও বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কের অভাব ঘটে।*[২১]

তবে শুধু আর্থিক দৈন্যই নয়, সামাজিক দীনতাও অনেকাংশে শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী। মায়া গুপ্তা এক্ষেত্রে সামাজিক কিছু প্রথা ও অভিভাবকদের মানসিক উদার দৃষ্টিভঙ্গির অভাবের কথা বলেছেন। তিনি বলেন–

> *অর্থবান হওয়া সত্ত্বেও অভিভাবকগণ প্রায়ই মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দানে অবহেলা করে থাকেন। সামাজিক কারণেও মেয়েদের বিশ বৎসরের অধিক বয়সে শিক্ষা দেওয়া হয় না। প্রায় নারীকেই বিশ বৎসর বয়সের পুর্বে কয়েকটি সন্তানের জননী হতে হয়। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যায় যে, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের শিক্ষার পথে বাধা অর্থাভাব নয়, সামাজিক প্রথা। আমাদের দেশে শিক্ষা প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ, কিন্তু বিয়েও কম ব্যয় সাপেক্ষ নয়। যেভাবেই হোক মেয়েদের বিয়ে হয় কিন্তু তারা উচ্চ শিক্ষা পায় না কেন?*[২২]

অনেক সময় নারীরা বি.এ., এম.এ. ডিগ্রিলাভ করে শিক্ষিত নারী হিসেবে পরিচিতি পেলেও কার্যক্ষেত্রে শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য তারা কতখানি ধারণ করতে পেরেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে। বেগম নাজমা খাতুন 'শিক্ষিতা মহিলাদের দরবারে' শীর্ষক নিবন্ধে এ মনোভাবই পোষণ করেছেন এই ভাষায় –

> *বেগম রোকেয়ার প্রচেষ্টায় এ-দেশের বহু নারীই শিক্ষিত হয়েছেন সত্যি কিন্তু তাঁরা অনেকেই রোকেয়ার আদর্শকে অনুসরণ করতে পারেন নি, এইখানেই তাঁদের সবচেয়ে বেশী বিচ্যুতি ঘটেছে। মোটা মোটা বই পড়ে আর বিভিন্ন দেশের প্রগতির ছবি দেখে, কস্‌টিউম পরে, প্রাইভেট পুলে সাঁতার কাটতে পারেন, নাইট গাউন পরে প্রাইভেট ক্লাবে গিয়ে পিঙপঙ খেলতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে বিচিত্র ভংগিতে জর্জেট পরে মার্কেটিং-এ বেরুতে পারেন অথচ সমাজ সম্বন্ধে ও নারীদের অশিক্ষা সম্বন্ধে এতটুকু ভাববার অবকাশ পান না। আশ্চর্যের কথা এই যে, শিক্ষিতা মেয়েরা বহু ক্ষেত্রে সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্তর বিভাগ সৃষ্টি করতেও উৎসুক। সমাজের যে শ্রেণীর মেয়েদের তাঁরা বাড়ীতে চাকরাণী রূপে ব্যবহার করেন, তাঁদের যে শিক্ষা পাওয়া উচিত এবং তাঁদের জীবনও যে সম্মানিত জীবন হতে পারে এ তাঁদের চিন্তার বাইরে।*[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার প্রভাবে অনেক নারীগৃহের প্রতি, পরিবারের প্রতি অমনোযোগী হয়েছেন, অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনকে জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছেন এরূপ অভিযোগও এতে করা হয়েছে। আবার অনেকেই শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি না করে শুধু সুপাত্রের আশাতেই নারীদের শিক্ষিত করে থাকেন– এহেন মন্তব্যও প্রকাশ করা হয়েছে। এ-অভিযোগসমূহের বিরুদ্ধে যে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তা হলো –

> *শিক্ষিতা মেয়েরা সংসারে যদি বা কখনো কেউ অমনোযোগী হয়, সেটা শিক্ষার দোষ নয়, প্রকৃত নারীশিক্ষার প্রভাব ও শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটি তার জন্য দায়ী।*[২৪]

তবে ফলাফল যাই হোক, শিক্ষাকে যে কোনভাবেই আর এড়িয়ে চলবার উপায় নেই বরং শিক্ষা যাতে নেতিবাচক না হয়ে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে সেদিকে লক্ষ্য রাখাই আশু প্রয়োজন বলে মায়মুনা পারভেজ দৃঢ় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন– 'মহিলাদের কলেজীয় শিক্ষার গুণাগুণ' শীর্ষক নিবন্ধে–

> *যে কোন অবস্থাতেই হোক, দেশ, জাতি এবং সামাজিক কল্যাণের তাগিদে আধুনিক দুনিয়ায় নারীশিক্ষাকে সমর্থন না করে গত্যন্তর নাই। সংগে সংগে উচ শিক্ষা লাভের সুযোগ যাতে গৃহের আংগিক সজ্জায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন।*[২৫]

কী ব্যক্তিজীবনে, কী সমাজজীবনে শিক্ষা এতখানি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের প্রচেষ্টা ছিল একেবারেই হতাশাজনক। স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নয়ন সাধন করা যায়নি। নানাবিধ সমস্যা শিক্ষাব্যবস্থাকে ত্রুটিপূর্ণ করে রেখেছে। শিক্ষকদের বেতন কাঠামো এর মধ্যে অন্যতম। শিক্ষকদের বেতন আকর্ষণীয় না হওয়ার কারণে শিক্ষকদের মান সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত হতে পারে না। তাঁরা শুধু কর্তব্যের খাতিরে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ওঠা-বসা করেন। আর শিক্ষকদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরাও কলের পুতুলের মত হয়ে যায়। পুরো শিক্ষা কার্যক্রমে আনন্দের, প্রাণের যোগাযোগ ঘটে না। দীনিতা রহমান 'জাতীয় জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধে অনেকটা যেন হতাশ হয়েই লেখেন—

> *স্বাধীনতা লাভের আজ বাইশ বছর হতে চলল। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে শিক্ষার দৈন্য এখনো ঘুচলো না। বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা ঠিক যেমনটি পেতে চেয়েছিলাম তা পাই নি। শুধু ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা বা পড়ানোর শিক্ষাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষা হওয়া উচিত নয়। প্রাণের শিক্ষা, চেতনার শিক্ষা, হৃদয়ের শিক্ষা, বোধের শিক্ষা ও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অঙ্গ হওয়া উচিত। প্রতিটি শিক্ষার্থীর চিত্ত যেদিন শিক্ষার আনন্দে সিক্ত হয়ে, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত শিক্ষাকে সমাজের কাজে, জাতির কাজে নিয়োজিত করবে সেদিন–ই জাতীয় মঙ্গল সাধিত হবে।*[২৬]

আবার অনেক লেখিকাই প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিকে নারীর সাংসারিক জীবনের জন্য যথোপযুক্ত মনে করেননি। তাফিকুন্নেসা করিম এ-প্রসঙ্গে বলেন–

Dhaka University Institutional Repository

> *বর্তমানে মেয়েদের যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয় তা, বিশেষত কলেজী শিক্ষা যে মেয়েদের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী নয় তা অনেকেই উপলব্ধি করেছেন। উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েরা যখন বিয়ে করে ঘর সংসার করতে যান, তখন এই কলেজী বিদ্যাটা যে আদৌ কার্যকরী হয় না, তা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতীয়মান হয়। রান্না বান্না বিশেষ করে সন্তান পালন সম্বন্ধে এই শিক্ষাব্যবস্থাকে আদৌ যোগ্যতর বলা যায় না। সাধারণ মেয়েদের চেয়েও তাঁরা এ-সম্বন্ধে অপটু প্রতিপন্ন হন।*[২৭]

এই সমস্যার সমাধানে তিনি নতুন শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছেন যেখানে প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে মেয়েদের আদর্শ গৃহিণী করে তোলা। আর এজন্য গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিটি দিক সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে।

'বেগম'-এর অনেক রচনাতেই সংসারের যাবতীয় সুখসুবিধার পেছনে মূল ভূমিকা গৃহিণীর বলে উল্লেখ করা হয়। স্বামীর কর্মজীবনের সফলতায় মূল ভুমিকা পালনকারী হলেন গৃহিণী। তাই স্বামীর জীবনে উন্নতি তথা নিজের উন্নতির জন্য প্রতিটি গৃহিণীকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এমনকি কর্মজীবনে স্বামী যাতে অন্যায় পথে পরিচালিত না হয় সেদিক সতর্ক দৃষ্টি রাখা আদর্শ গৃহিণীর একটা বড় কর্তব্য করা মন্তব্য করা হয়।[২৮]

'৪৭-পরবর্তী পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে নারীশিক্ষার ধারাবাহিকতায় আর একটি প্রসঙ্গে বিজ্ঞজনেরা নারীকে নিয়ে ভেবেছেন– তা হল রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে নারীর অংশগ্রহণ। সমাজের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে নারীর অবস্থান, কাজেই অবধারিতভাবে প্রশ্ন এসে যায় শাসন তন্ত্র ক্রিয়ায় স্বতন্ত্রভাবে এই অংশের প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজনীয় কিনা। রেবেকা সুলতানা চৌধুরী এক্ষেত্রে স্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন এভাবে–

> *মেয়েদের রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে নানারকম জল্পনা চলছে আজকাল। আমার মতে তাদের নিজস্ব সত্তার উপলব্ধি, পরিপুষ্টি ও জাতীয় মঙ্গলের জন্যে রাষ্ট্রে অধিকার একান্ত দরকার। মেয়েদের সুখ-সুবিধা, অভাব, অভিযোগ মেয়েরাই ভাল বোঝেন। এর জন্যে চাই রাষ্ট্র শাসনকার্যে আনুপাতিক হারে মেয়ে প্রতিনিধি নিয়োজিত করা। আর এঁরা এঁদের প্রতিনিধিত্ব পাবেন মেয়েদেরই ভোটে। শিশুপালন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, নারীর ভোটাধিকার, মাতৃত্ব ও পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানকল্পে যে সমস্ত আইন প্রণয়ন হবে তাতে নারীর মতামত লওয়া একান্ত কর্তব্য।*[২৯]

সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, আধুনিক মনস্কতায় অবগাহন করে নারী এবং জাতিকে প্রগতির পথে অগ্রবর্তী হবার প্রেরণা জানাতে সর্বদাই তৎপর ছিল 'বেগম'। কিন্তু এই প্রগতির আবরণে মানবধর্মকে যেন বিসর্জন দেয়া না হয় পাশাপাশি সেই আকুতিও জানিয়েছে। প্রগতি মানেই অতি আধুনিকতা বা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ নয়। বরং নিজস্ব সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক হয়েই প্রগতিকেও ধারণ করতে হয়ে। নাজমা বেগম 'প্রগতি ও বাঙ্গালী মুসলিম নারী' শীর্ষক প্রবন্ধে এ-সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন–

> *একই যুগে যে দেশ সংস্কৃতিতে ও চিন্তাধারায় সর্বাপেক্ষা আধুনিক সেই দেশকেই আমরা আসল প্রগতিশীল বলবো কিন্তু যে দেশ প্রগতির নামে মানবধর্মের নীতিকে বিসর্জন দিয়েছে, সে*

Dhaka University Institutional Repository

> *দেশকে সত্যিকারের প্রগতিশীল দেশ বললে ভুল হবে। সাগরপারের প্রগতিশীলরা যেমন ঝিনুক নিয়ে সহজে খেলা করতে পারে, তেমনি পারে তারা তাদের নতুন পুরুষ বন্ধুটির সঙ্গে সহজে মিশতে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রগতিশীলরা এর ব্যর্থ প্রয়াসে বহুক্ষেত্রে অপমানিত করেন তাদের সাংস্কৃতিক মুক্তিকে তাদের প্রগতিকে।*[৩০]

শিক্ষা যেমন দেশের সর্বত্র সমানভাবে পরিব্যপ্ত হয়নি, যাদের আর্থিক সামর্থ আছে, সর্বোপরি যারা চিন্তা চেতনায় বিজ্ঞানমনস্ক, কুসংস্কারের বেড়াজাল মুক্ত তারাই পেরেছেন এর আবাদ গ্রহণ করতে ও জীবনের অংশে পর্যবসিত করতে। প্রগতিও তেমনি সর্বসাধারণে পরিব্যাপ্ত হয়নি, ফলে আচার-বিচারে সংস্কৃতিতে সংস্কৃতিতে পার্থক্য বজায় থেকেছে আগের মতোই। নাজমা বেগম-এর ভাষায়—

> *প্রগতির হাওয়া আমাদের ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশেও লেগেছে। কিন্তু এ হাওয়া যেন খানিকটা দমকা হাওয়ার মতো। দমকা হাওয়া যেমন হঠাৎ কতগুলি স্থানের ধূলাবালি উড়িয়ে নিয়ে জায়গাগুলিকে পরিষ্কার করে দিয়ে যায়, তেমনি এই প্রগতির হাওয়া বাংলার কয়েকটি অঞ্চলের ময়লা মাটি কিছুটা পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। তাই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য এত বেশী।*[৩১]

'প্রগতি'র ন্যায় বাঙালি'র 'সভ্যতা' সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাও একই রকম। সভ্যতা মানব জাতির সবচেয়ে বড় অহংকার। কিন্তু এই সভ্যতার উপাদানগুলোরই অপব্যবহার ঘটে মানুষেরই হাতে। সভ্যতা হয়ে পড়ে পোষাকী আবরণ, ভিতরে মানুষ হয়ে পড়ে কৃত্রিম। যেমন— জয়শ্রী বসু তাঁর 'সভ্যতার বিড়ম্বনা' শীর্ষক নিবন্ধে বলেন–

> *কেউ বা মোটর গাড়িতে চাপে আবার কেউ মোটর গাড়ি চাপা পড়ে। বর্ষার জল-কাদার দিনে কেউ বা মোটর গাড়ি চালিয়ে রাস্তার কাদা ছিটাতে থাকে, কেউ বা সেই কাদার ঝাপটা খায়। এছাড়া হঠাৎ পিছন থেকে এসে হর্নটা বিকট আওয়াজ করে চমকে দিয়ে যায়– প্রকৃত প্রস্তাবে সভ্যতা বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে বাইরের সভ্যতা, ভেতরের নয়। এই বাইরের সভ্যতা আমাদের যত বাড়ছে, ভেতরে ভেতরে আমরা ততই অসভ্য হয়ে উঠছি। আমাদের সভ্যতা এইভাবে আমাদের সঙ্গে অসভ্যতা করছে। আমরা যত সভ্য হচ্ছি ততই প্রকৃতির দূরে সরে পড়ছি, স্বাভাবিকতার স্থান দখল করছে অস্বাভাবিক কৃত্রিমতা।*[৩২]

'বেগম'-এ ধারাবাহিক একটি রচনা ছিল 'পল্লী উন্নয়ন' শিরোনামে। একটি নবগঠিত রাষ্ট্রের উন্নয়নে সর্বাগ্রে নজর দিতে হয় উক্ত রাষ্ট্রের পল্লীঅঞ্চলের দিকে। কারণ নগরায়ণ শুরুর পূর্বে কিংবা নগরায়ণের গোড়ার দিকেও রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ অবস্থান করে পল্লীতে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের মতো একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নে পল্লী অঞ্চল এবং তার জনগণের অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো প্রধানতম পূর্বশর্ত হয়ে দেখা দেয়। এই পূর্বশর্ত পূরণের লক্ষ্যেই পল্লীএলাকার উন্নয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে 'বেগম'। গ্রাম এলাকায় কৃষিকাজ থেকে শুরু করে ঘরের পাশেই বাগান, গ্রামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, গ্রামীণ জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা, গ্রামীণ নারীর

Dhaka University Institutional Repository

সৌন্দর্য, সর্বোপরি পল্লীর উন্নয়নে সার্বিক দিক নির্দেশনা সম্বলিত ছিল ধারাবাহিক রচনা 'পল্লী উন্নয়ন'।

এক্ষেত্রে আর একটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হলো পল্লীর নারীদের শিক্ষিত করে তোলা। নাগরিক জীবনের সুবিধা ভোগকারী এবং আর্থিক দিক দিয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত নারী শ্রেণীর ওপর এই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। পল্লীর মেয়েদের দুর্দশার বর্ণনা দিয়ে বলা হয়–

> *নারী আন্দোলনকে সফল করতে হলে এসব মুক জড় নারীর মুখে ভাষা ফুটাতে হবে। এর জন্য সবার আগে প্রয়োজন হলো এদের শিক্ষার, গ্রামে গ্রামে খুলতে হবে নারী শিক্ষাকেন্দ্র, নারী হাসপাতাল, শিশুমঙ্গল ইত্যাদি অনেক কিছু। যারা কিছু জানে না, বোঝে না, তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে আমরা কী? আর হয়ে আছি কী?*[৩৩]

ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা করা হয়েছে বহুলভাবে। আপাতদৃষ্টিতে দূষণীয় বলে মনে না হলেও এই সব ভিখারীর দল যে একটি দেশের জন্য কত বড় কলঙ্ক তা অবর্ণনীয়। এরা যে কেবল দেশের অর্থসম্পদের একটা মোটা অংশের অপচয় করে তাই নয়, বিদেশীর চোখে দেশকে অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করার পথও প্রশস্ত করে। ভিক্ষাবৃত্তি বিলোপের জন্য 'বেগম' কিছু সুপারিশ করেছে যেমন–

১. *আইন করে ভিক্ষাবৃত্তিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা এবং আইন অমান্যকারীদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করা।*
২. *আইন করার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ভিক্ষার্থীর পুনর্বাসনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা। যারা দৈহিকভাবে পঙ্গু তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দ্বারা ভালো করে তোলার ব্যবস্থা করে বিভিন্ন বৃত্তিগত ট্রেনিং দেওয়া।*
৩. *জনশিক্ষার প্রসার ঘটানো।*
৪. *উন্নততর চাকুরী ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।*[৩৪]

বিয়ে একটি সামাজিক প্রথা। সামাজিক কারণে যেমন বিয়ে অপরিহার্য, তেমনি ইসলামও নর-নারীর জীবনে বিয়ে ফরজ করেছে। কিন্তু এই অপরিহার্য কাজটিও একসময় সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়। অর্থাৎ নর ও নারীর সঠিক সময়ে বিয়ে হয় না। এ-প্রসঙ্গে 'বেগম'-এ প্রকাশিত একটি চিঠির কথা উল্লেখ করা যায়, যেখনে একজন নারী তার জীবনে বিয়ে না হওয়া সংক্রান্ত সমস্যার উল্লেখ করেছেন–

> *বর্তমানে আমার বয়স প্রায় ২২ বৎসর এবং আমার ছোট বোনের বয়স প্রায় ১৯ বৎসর। জানিনা মা-বাবার নিকট কি অপরাধ করেছি। কিছুদিন পূর্বে একজন ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উঠেছিল এবং আমিও রাজী ছিলাম কিন্তু আব্বা তা অগ্রাহ্য করলেন। তিনি এখন চান একজন ভাল গ্রাজুয়েট ছেলে বা উচ্চপদের অফিসার, সেই হতভাগাদের কবে কোথায় কোনদিন যে পাব জানি না।*[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত চিঠিতেই তৎকালীন সমাজের বিয়ে সমস্যা এবং তার কারণেরও কিছুটা আলোকপাত পাওয়া যায়। অর্থাৎ পাত্র হিসাবে শিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নির্বাচন করা হয় কিন্তু এরূপ পাত্র সংখ্যা কম হওয়ায় অপরদিকে বিবাহযোগ্যা নারীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। আরও একটি বিষয় এই সমস্যা ত্বরান্বিত করে, তা হলো– যৌতুক বা পণপ্রথা। পণপ্রথা এক সময়ে হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে এ সমস্যা মুসলিম সমাজেও জাঁকিয়ে বসে। এ-প্রসঙ্গে বলা হয়–

> *বাঙালি হিন্দুসমাজ এই প্রথার কবলে পড়ে, যে কত দুর্ভোগ সহ্য করেছেন, আজও হয়তো হচ্ছে তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ইদানীং এই প্রথা বাঙালি মুসলিম সমাজকেও অক্টোপাসের বন্ধনে বাঁধবার তীব্র প্রয়াস পাচ্ছে। সাধারণত বড়লোক বাপের অল্পশিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা মেয়েদের শিক্ষিত পাত্রে সম্প্রদান করতে অনেকাংশে এই বন্ধনকে দৃঢ়তর করেছে।*[৩৬]

যৌতুকপ্রথার তীব্রতা যে কত ভয়াবহ তা কাজী বুলবুল আখতার ছবুর তাঁর লেখনীতে প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন–

> *পশ্চিম পাকিস্তানে এই যৌতুক প্রথা কত যে ভয়াবহ আকার ধারণ করে আছে তা কল্পনা করা যায় না। এখানকার সম্পন্ন ও শিক্ষিত পরিবারেও উপর্যুপরি দু'তিন মেয়ে হলে মা আড়ালে চোখ মুছেন, বাবার কপালে চিন্তার কালো রেখা পড়ে। মেয়ের দু'তিন বছর বয়স থেকেই এরা যৌতুকের জিনিস জমা করতে থাকেন। শুধু বরকেই যে প্রচুর পরিমাণে দিতে হয় তা নয়, বরের মা, বাবা, ভাই, বোন, ভাবী, ভগ্নিপতি সকলকেই অলঙ্কার ও কাপড় চোপড় দিতে হয়। এমনকি উচ্চশিক্ষিত পরিবারেও এই প্রথা তার ভয়াবহতাকে বিন্দুমাত্র শিথিল করে নাই।*[৩৭]

যৌতুকপ্রথার জন্য শুধু পাত্রপাত্রীর অভিভাবকরাই যে দায়ী তা নয়, বরং স্বয়ং পাত্রের দায় দায়িত্ব এক্ষেত্রে অনেক বেশি বলে মনে করেন মোশফেকা মাহমুদ। তিনি বলেন–

> *স্বীকার করি, পণপ্রথা উদ্ভবের জন্য বেশী দায়ী কন্যার অভিভাবক। কারণ তিনি টাকার টোপ ফেলেছেন, মাছ তো ভাল টোপের লোভে এগিয়ে আসবেই। কিন্তু একথাও ঠিক – যে ছেলের একটু আত্মমর্যাদাবোধ আছে সে শ্বশুরের টাকায় কৃতী হতে চাইবে না। সে নিজে জীবনযাত্রায় যুদ্ধ করে সফলতা আনবে। আর একটি আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে যে সব ছেলে উঁচু শ্রেণীতে ঢুকছে তারা বিনা পণে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে না নিয়ে ১৫/২০ হাজারের সাথে বড়লোকের অশিক্ষিত মেয়ে ঘরে আনছে।*[৩৮]

সামাজিক সমস্যা হিসেবে শুধু নর-নারীর বিয়ে না হওয়া নয়, আরও একটি সমস্যা এর সঙ্গে যুক্ত হয়, তা হলো বহুবিবাহ। প্রধানত নিম্নবিত্তের শ্রেণীতে বহুবিবাহের প্রচলন থাকলেও তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী প্রথম স্ত্রীর জীবিতাবস্থাতেই দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করায় বহুবিবাহের বিরুদ্ধে শিক্ষিত নাগরিক সমাজে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। ইসলামে বহুবিবাহের সমর্থন আছে– এই দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের শতশত পুরুষ বহুবিবাহের পথ অনুসরণ করার

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষপাতী। কিন্তু ইসলামের বহুবিবাহের তাৎপর্য আর পাকিস্তানের পুরুষদের ব্যক্তিজীবনে বহুবিবাহের অনুশীলনে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য লেখিকা কাজী জাহানারা বেগম খুব স্পষ্টভাবে তা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন–

> *ইসলামী শাস্ত্রে চারি বিবাহের অনুমোদন আছে, কিন্তু তা বিশেষ ক্ষেত্রে এবং তার জন্য বিশেষ শর্তও আছে। কিন্তু এই শর্তগুলি কয়জন মহাপুরুষ পালন করেন? তা যদি করতেন, তাহলে আজ নারীসমাজ বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতেন না। একটি বিবাহ করলাম, আর একটিকে ত্যাগ করলাম হাদীসের দোহাই দিয়ে। কেবল স্ত্রী নয়, অনেকে আবার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পক্ষের নবপরিণীতার পাল্লায় পড়ে প্রথম পক্ষের সন্তান সন্ততির কথাও বিস্মৃত হয়। স্বীয় পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যই ইসলামের দোহাই, শাস্ত্রের দোহাই। যারা এই দোহাই দেয় তারা জানে না যে, ইসলাম সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য এবং উদারতার ধর্ম। যে ইসলাম একসঙ্গে চারজন স্ত্রী রাখার বিধান দিয়েছে সেই ইসলামই আবার বলছে – প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করতে পারবে না।*[৩৯]

ইসলামে বহুবিবাহ প্রথা সম্পর্কে আর এক স্থানে বলা হয়েছে–

> *মুসলিম সমাজে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া অনেকেই ইসলামের উপর দোষারোপ করিয়া থাকে। কিন্তু সাধারণত লোকে এ সম্বন্ধে যেরূপ মনে করিয়া থাকে সেইভাবে বহুবিবাহ সম্বন্ধে কোন যথেচ্ছ বা শর্তহীন অধিকার দেওয়া হয় নাই। এ সম্বন্ধে কতকগুলি বাধা ও নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে, যথা (১) একসঙ্গে চারিজনের অতিরিক্ত পত্নী রাখা কোনক্রমেই চলিবে না এবং (২) সমস্ত স্ত্রীর সহিত সম ও একই ধরনের ব্যবহার করিতে হইবে। প্রণয় ও আসক্তি সহ কোন বিষয়েই দুইজন স্ত্রীর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বা ভেদরেখা থাকিতে পারিবে না।*[৪০]

বহুবিবাহের সঙ্গে সঙ্গে অবধারিতভাবে আর যে প্রসঙ্গটি এসে যায় তা হলো বাল্যবিবাহ। আমাদের মতো একটি স্বল্পশিক্ষিত, দরিদ্র, ধর্মভীরু এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন ব্যাপক। বৈচিত্র্যহীন, একঘেঁয়ে, অলস, কর্মবিমুখ মানব জীবনে 'বিয়ে' অন্যতম বিনোদন হিসেবে গণ্য হওয়ায় এই ধর্মভিত্তিক সমাজে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। বিয়ের জন্য মুসলিম সমাজে অল্প বয়সেই মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। অপরদিকে বিয়ের সম্ভাবনা না থাকলেও মুসলিম সমাজে মেয়েদের একটু বয়স হলেই বাইরে বের হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ বয়স্কা মেয়েরা নানাদিক থেকে পিতা-মাতার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে পড়ে। এই দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেতেও পিতামাতা অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেন। এক্ষেত্রে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয় ইসলামি শরিয়তকে। যদিও এই অনৈতিক কাজের পেছনে ইসলামি শরিয়তের কোনও ধরনের যুক্তিই নেই; বরং ইসলাম এ-ধরনের বাল্যবিবাহকে যে পুরোপুরি অসমর্থন করে, লেখিকা বেগম শামসুন নাহার করিম তা-ই ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন–

> *বলাই বাহুল্য ইসলাম বাল্যবিবাহ বা অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ের ঘোর বিরোধী। আল কোরানে অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, 'সন্তানদের বিয়ের বয়স নির্ধারণের পূর্বে তাদের পরীক্ষা করে নাও। আল কোরানের এই উদ্ধৃতাংশের ব্যাখ্যায় বলা হয়, বিয়ের পূর্বে ছেলেমেয়ের*

Dhaka University Institutional Repository

> *নৈতিক অর্থকরী শিক্ষা দিতে হবে। ইহা নিশ্চিত সত্য যে, নৈতিক শিক্ষাই মানুষকে নানা সামাজিক ও যৌন দুরাচার থেকে রক্ষা করতে পারে। কাজেই ছেলেমেয়েদের নৈতিক শিক্ষার ওপর সবিশেষ জোর দিতে হবে। তার অর্থ এই নয় যে, পারিবারিক, অর্থকরী ও অন্যান্য শিক্ষার প্রয়োজন নেই। নৈতিক শিক্ষা ছেলেমেয়েদের নৈতিক মান সম্পর্কে সচেতন করবে, আর পারিবারিক ও অর্থকরী শিক্ষা বিবাহিত জীবনে তাদের যাবতীয় সমস্যার মোকাবেলা করতে সহায়তা করবে।*[৪১]

সেক্ষেত্রে মেয়েদের বিয়ের প্রকৃত বয়স কত হওয়া উচিত সেই প্রশ্নটি এসে যায়। একথা ঠিক যে, এই প্রশ্নের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য কোনও জবাব দেয়া সম্ভব নয়। কারণ মেয়েদের শারীরিক গঠন সমাজ ও দেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। তথাপি চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের যুক্তির ওপর নির্ভর করে ন্যূনতম কত বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়াটা নেহাৎ অযৌক্তিক হবে না লেখিকা সেই অনুসন্ধান করেছেন–

> *আমেরিকার দু'জন প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদের মতে মেয়েদের বিয়ের উপযুক্ত সময় আঠার বছর পার হয়ে যাওয়ার পর। তাঁরা বলেন, যদিও মেয়েরা আঠার বছরের পূর্বে সন্তান ধারণ করতে পারে তবুও তারা স্বাস্থ্যগত ও বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব পালনের দিক দিয়ে অপরিণত। ইসলামী শাস্ত্রবিদরাও এই মত পোষণ করেন। যদিও এর বিরোধী মত যে একেবারে দেখা যায় না তা নয়। শাস্ত্রবিদরা মনে করেন, মেয়েরা সতের বছর বয়সে সন্তান ধারণ করতে পারেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানও তাই বলে। কোন কোন শাস্ত্রবিদ আবার ষোল বছর বয়সের কথাও বলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দুটো মতই প্রধান, সতের এবং ষোল। যদি সতের বছরের মেয়েদের পরিণত বয়স্কা বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে মেয়েদের বিয়ের উপযুক্ত বয়স আঠার থেকে আরম্ভ হয়। আর যদি ষোল বছরের মেয়েদের পরিণত বয়স্কা মনে করা হয় তবে বিয়ের উপযুক্ত বয়স হয় সতের থেকে। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা ষোল, সতের বছরের এই সূক্ষ্ম ভেদরেখায় না গিয়ে সার্বিকভাবে মেয়েদের বিয়ের উপযুক্ত বয়স আঠার বা তারপর থেকে নির্ধারণ করেছেন। কারণ শুধু সন্তান ধারণের যোগ্যতাই নয়, পাশাপাশি সাংসারিক, পারিবারিক দায়িত্ব পালনের জন্য মানসিক পরিপক্বতাও প্রয়োজন।*[৪২]

বিয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে আর একটি ক্ষেত্রের অস্ত্র তুলে দিয়েছে– তা হচ্ছে বিয়েতে সম্মতিদান। এই বিষয়টিও 'বেগম' আলোচনায় তুলে এনেছে একারণেই যে– আমাদের সমাজে খুব কম ক্ষেত্রেই বিয়ের সময় নারীর মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয়। বস্তুত ইসলাম নারীকে অনেক উচ্চ মর্যাদায় প্রতিস্থাপন করেছে, অথচ কতিপয় অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সুযোগসন্ধানী মানুষের হাতে পড়ে নারীর এই উচ্চমর্যাদার অবমাননা করা হয়, উপরন্তু এই অবমাননার ক্ষেত্রে ইসলামেরই দোহাই দেয়া হয়। সাপ্তাহিক 'বেগম'-এই স্বার্থান্বেষী মহলের হাত থেকে ইসলামকে রক্ষা করতে চেয়েছে এবং নারীকে দিতে চেয়েছে তার যোগ্য আসন। একারণেই 'বেগম' নারী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বিয়ে-র ইসলামি তাৎপর্য এবং ইসলামি বিধান স্পষ্ট করতে সচেষ্ট হয়েছে। বিয়েতে নারীর মতামতের গুরুত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হয়–

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিবাহ উৎসবের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইতেছে পাত্রীর সম্মতিগ্রহণ। এই রীতি নারীর পক্ষে আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্রস্বরূপ। মাতাপিতা বা অভিভাবকগণ যদি জোর করিয়া পাত্রীকে অবাঞ্ছিত পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে এই 'সম্মতি' অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বিবাহ পণ্ড করিয়া দিতে পারে। পাত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে কোন কাজীই সম্মত হইতে পারেন না। আর যদিও হন, তাহা তাহার নিজের দায়িত্বে। এই ধরনের বিবাহের পর পাত্রী স্বামী গৃহ গমনে বা তাহার সহিত বসবাস করিতে অসম্মত হইতে পারে এবং বিবাহও অবৈধ সাব্যস্ত হয়। স্বেচ্ছায় বিবাহে মত দানের পরেও পাত্রী যদি বুঝিতে পারে যে এই বিবাহে তাহাকে ঘোরতর অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইলে সে আইনত বিবাহ অসিদ্ধ এবং অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। কিন্তু সহবাসের পূর্বে ইহা করা দরকার। সহবাসের পর স্বামীর মৃত্যু বা আইনত তালাক দ্বারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে।[৪৩]

একটি রাষ্ট্রের বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাকার প্রবণতার একটি অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে জনসংখ্যার আধিক্য। পূর্ব পাকিস্তানও এর ব্যতিক্রম ছিল না এবং সমাজের প্রহরী (watch dog) হিসেবে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, লেখিকারা সে-বিষয়ে সচেতন ছিলেন পুরোমাত্রায়। 'পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে বেগম ফাতেমা রহমান এই সমস্যার ওপরই আলোকপাত করেছেন এই ভাষায়–

পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন, জনসংখ্যা ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ইহা নিঃসন্দেহে একটি ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। এ-দেশের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন লোকই অর্থনৈতিক কারণে অত্যন্ত নিম্নমানের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের অধিবাসীরাই নানা প্রকার দুরারোগ্য ব্যধিতে বেশী করে আক্রান্ত হয় এবং দৈনন্দিন অসংখ্য অভাব-অভিযোগের মধ্যে কাল যাপন করে। এ দেশের জনসাধারণের এই সব দুর্গতির মূলেই হচ্ছে জনসংখ্যা সমস্যা।[৪৪]

বেগম ফাতেমা রহমান জনসংখ্যা সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই শেষ করেননি পাশাপাশি এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়ও তিনি বাত্লেছেন। সার্বজনীন সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তিনি আর যেসব বিষয় উল্লেখ করেছেন সেগুলো হলো–

জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তার, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ করা, দেশকে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করা, শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে কৃষিব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং কৃষির দ্বারা বেকারত্ব দূর করে সেই সময়ে কুটির শিল্পের কৃষকদের নিযুক্ত করা।[৪৫]

অনেক লেখিকাই জনসংখ্যা সমস্যার প্রধান সমাধান হিসেবে পরিবার পরিকল্পনাকে বেছে নিয়েছেন। 'জনসংখ্যা সমস্যা ও আমাদের ভবিষ্যত' শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপিকা শামসুন নাহার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনার অপরিহার্যতা এবং তার বহুবিধ কার্যকারিতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করেন, পরিবার পরিকল্পনা যে শুধু একটি পরিবারকে আর্থিকভাবে সচ্ছল করে তাই নয়, বরং সামাজিক, শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকেও এর কল্যাণকর প্রভাব রয়েছে। তার ভাষায়–

Dhaka University Institutional Repository

> *জন্মের হারের মতো আমাদের দেশে মৃত্যুর হারও তুলনামূলকভাবে অন্যান্য দেশের চাইতে অনেক বেশী। তন্মধ্যে প্রসূতি এবং নবজাত শিশুদের মৃত্যুর হার বেশী। অতিরিক্ত হারে সন্তানের জন্মই এর প্রধান কারণ। ঘনঘন সন্তান জন্মের ফলে আমাদের দেশের মায়েদের স্বাস্থ্য ভেংগে পড়ে এবং সেই দুর্বল শরীরে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে অনেককেই অকালমৃত্যু বরণ করতে হয়। ঘনঘন সন্তান প্রসবের দরুন প্রসূতিদের স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হয়, তাদের মনের ওপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। ফলে অনেক সময় তাদের দাম্পত্য জীবনও বিষময় হয়ে ওঠে। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করলে এসব বিপর্যয় অতি সহজেই এড়ানো যায়।*[৪৬]

এক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে একসঙ্গে কাজ করে শহরে ও গ্রামে পরিবার পরিকল্পনার বাণী পৌঁছে দেবার কথা বলেছেন। পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত চিন্তায় পাপ, দোষ, অন্যায় এজাতীয় ভাবনার জবাবে মিসেস জাহানারা মুন্সী বলেন–

> *শাস্ত্রে আছে, 'জীবহত্যা মহাপাপ' কিন্তু জীব আদৌ সৃষ্টি হবার আগেই যদি এ-বিষয়ে একটু সতর্ক হন তাহলে মহাপাপের সংস্পর্শে যেতে হয় না বলেই আমার বিশ্বাস।*[৪৭]

রাষ্ট্রগঠনে নারীর ভূমিকাকে আরো সূক্ষ্ম পর্যায়ে বিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। 'বেগম'-এনে করে নারীর প্রতি যেসব পরামর্শ দেয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা। রাষ্ট্রের উন্নয়নে পুঁজির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে সেই পুঁজি সংগ্রহের উপায় খুজতে চেষ্টা করেছেন 'বেগম' সেলিনা আহমদ তাঁর 'জাতীয় সঞ্চয় আন্দোলনে নারীর ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে। পুঁজি বৃদ্ধির সহজতম উপায় হচ্ছে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা। এ-প্রসঙ্গে বলা হয়–

> *যদি সঞ্চয় এবং পুঁজি বিনিয়োগ স্বল্প হয় তাহলে ব্যক্তিগত আয়ও কম হবে, কর হবে অপর্যাপ্ত এবং সরকারের আয় ও ব্যয় দুটিই হবে সীমিত। কাজেই ব্যক্তির সঞ্চয়ের গুরুত্ব অপরিসীম।*[৪৮]

বেগম সেলিনা আহমদ প্রাত্যহিক ব্যয় ও জিনিসপত্রের ব্যবহার কমিয়ে তা সঞ্চয় করার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বিশেষ করে নারীদের এ-ব্যাপারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ মহিলারা সোনা-রূপার গহনা আর মূল্যবান পাথরে বেশ ভালো রকম অর্থই ব্যয় করে থাকেন। তাঁরা তা করেন এমন একটি মানসিকতা থেকে যার মিল পাওয়া যায় সেকেলে একজন কৃপণের মধ্যে। তা প্রায়ই উঠিয়ে নামিয়ে এবং বারবার করে তা দেখে তাঁরা আনন্দ পান এবং পরিতৃপ্তি লাভ করেন। অবসর মুহূর্তে তা আবার নামান, নেড়েচেড়ে দেখেন এবং আরো বেশি করে আনন্দ লাভ করেন। শুধু তাই নয় আজকের গয়না আবার কিছুদিন যেতে না যেতেই পুরনো ধরনের হয়ে উঠে চলমান রুচি আর ডিজাইনের সঙ্গে তা খাপ খেয়ে ওঠে না। তাই প্রয়োজন হয় আবার স্বর্ণকারের কাছে যাওয়ার এবং ভেঙেচুরে আবার গড়ানোর। এতে নতুন করে আবার মোটা অঙ্ক ব্যয় হয়। কাজেই সঞ্চয় হিসেবে অলঙ্কার একটি অচল সম্পদ। তাতে আয় আসে না কিছুই। আবার বিক্রি করতে গেলে তার মূল্য যায় কমে।[৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

শুধু অলঙ্কার নয় পোশাক পরিচ্ছদেও নারীরা অতিরিক্ত ব্যয় করে থাকে। তার ওপর রয়েছে অতি ভোজনের সংস্কৃতি এবং রসনা বিলাস। যে কোনও পার্টিতেই পোশাকের চাকচিক্য, খাদ্য পদের অহেতুক আধিক্য। যেখানে ৩/৪ টি পদ হলেই চলে সেখানে উপস্থাপন করা হয় ১২টি পদ। একটি দরিদ্র এবং উন্নয়নশীল দেশে যা হবার কথা নয়। এই অপচয় রোধ করে, অপচয়ের মানসিকতা রোধ করে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে সঞ্চয়ী হওয়া এবং তা উৎপাদন কাজে বিনিয়োগ করার মানসিকতা তৈরির কথা বলেছেন বেগম সেলিনা আহমদ। তাঁর ভাষায়–

> *বীজ বুনার আগে ফসল কাটতে বা ফসল তুলতে যাওয়া আমাদের আদৌ সাজে না। আমাদের সবারই এই অপচয় এড়িয়ে উৎপাদনমূলক ব্যবস্থার সঞ্চয়টুকু নিয়োগ করা উচিত। এখন একটু হিসাব করে চলার অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যতে ব্যক্তি এবং দেশ উভয়েরই জন্য বিরাট সমৃদ্ধি। আজ সঞ্চয় কাল ব্যয় এই হওয়া উচিত আমাদের সবার ব্রত।*[৫০]

বাংলার স্থাপত্যশিল্প নিয়ে বেশ কিছু নিবন্ধ রয়েছে সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকাতে (২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮, ৭ম বর্ষ ২১তম সংখ্যা ৮ আগস্ট ১৯৫৪)। স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় ও বর্ণনা দেয়ার মধ্য দিয়ে প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। আবহমান কাল থেকেই বাংলার স্থাপত্যশিল্প শাসকশ্রেণীর ধীকল্প (idea), রুচি, অভিরুচি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এর বিশেষ গুরুত্ব এই যে বিদেশী শাসকশ্রেণীর স্থাপত্য ও চিত্রকলা এতে এমনভাবে সমন্বিত হয়েছে যেন তা এদেশের ব-দ্বীপ পরিবেশ ও মৌসুমী আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারে। দেখা যায় যে, ভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে আগত প্রতিটি শাসকশ্রেণী এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রচলিত শিল্পরীতিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছে।[৫১]

স্থাপত্য শিল্পের পাশাপাশি লোকসাহিত্য নিয়ে গর্ব করে বাঙালি জাতি। ফলে 'বেগম'-এর পাতাতেও দেখতে পাওয়া যায় লোকসাহিত্য নিয়ে আলোচনা। লোকসাহিত্য একটি জাতির সাংস্কৃতিক সম্পদ। জার্মান ভাষায় একটি প্রবাদ আছে, কোনও জাতির অন্তরঙ্গ পরিচয় তার লোকসাহিত্যে পাওয়া যায়।[৫২] লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপাদান লোকসঙ্গীত (Folk songs)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন– গাছের শিকড়টা যেমন মটির সঙ্গে জড়িত এবং তার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি সাহিত্যের নিম্নাংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হয়ে ঢাকা থাকে[৫৩] যা বিশেষরূপে দেশীয়, স্থানীয়, লোকসঙ্গীতে মানুষের আদি মনের নগ্নরূপ– সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, প্রেম, মিলন, বিরহরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। লোকসঙ্গীতের গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়–

> *সরল গ্রামবাসীর জীবনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি - প্রতিবিম্বিত হয়েছে এই সব লোকসঙ্গীতে। তাই এই পল্লী গানগুলিও এক অমূল্য সম্পদ। ভাষায় নয়, ভাবে নয়, এই লোকসঙ্গীত তার চিরপরিচিত পরিবেষ্টনীকে ছাড়িয়ে তার কল্পনার চক্র রচনা করেনি, সৃষ্টি করেছে আপন মণ্ডলীতে আপন বাস্তব জীবনের বিরহ মিলনের কাব্যজগত, ভাবজগত। সমাজ জীবনে এই সব লোকসঙ্গীতের মূল্য যথেষ্ট*

Dhaka University Institutional Repository

আছে। ক্ষণিক আনন্দে নিজেকে ডুবিয়ে রাখার মত এমন সহজ, অনায়াসলভ্য সম্পদ সে যুগে আর কিছু ছিল না, তাই এই সব পল্লীসঙ্গীতগুলির চির নূতনত্ব ব্যাহত করে না কখনও, অথচ এসব অর্থহীন সদিচ্ছাকৃত গানগুলি লোকসঙ্গীতে প্রবাহিত হয়ে আসছে।[৫৪]

লোকসঙ্গীতের আর একটি ধারা লোকনৃত্য যা বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। লোকনৃত্য সম্বন্ধে মিস খালেতুন বেগম 'পূর্ব পাকিস্তানের লোকনৃত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন–

লোকনৃত্যের এই প্রাণ মাতানো ছন্দ, সুর ও তাল এদেশের সাধারণ মানুষের জীবন সুতায় গাঁথা। লোকনৃত্যের আবেশে তাই এখানকার জীবনধারা প্রাচ্যের অনুসারী, চিরাচরিত প্রাকৃতিক বৈচিত্রের প্রাচুর্য্যের মধ্যেই লোকনৃত্যের জন্ম। দিনের পর দিন নিত্যনতুন ভঙ্গীতে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখের প্রতিফলন করে থাকে এই লোকনৃত্যের মধ্য দিয়ে। এই নৃত্যে থাকে সাধারণ মানুষের জীবনকথা।[৫৫]

২১শ বর্ষ ৭ম ও ৮ম সংখ্যায় লুতফুন্নেসা আহমদ রচিত 'বারমাসী গীতি' শিরোনামে দুই খণ্ডে সমাপ্ত একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বারমাস্যা বা বারমাস নামে পরিচিত এই লোকগীতি মূলত বৎসরের বার মাসের বা ছয় ঋতুর বর্ণনামূলক গান। প্রত্যন্ত পল্লীএলাকায় বহুল প্রচলিত কিন্তু আধুনিক নাগরিক জীবন এই বারমাসী গীতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞাত। অথচ এই গীতি লোকসাহিত্যের এক বিশাল সম্পদ। কারণ ছয় ঋতুর পরিবর্তনশীল পটভূমিকায় মানবীয় সুখ-দুঃখের বিচিত্র ও স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে এই গীতি। এই গীতির প্রধান উপজীব্য গীতিরচনার পটভূমি, এর ঐশ্বর্য, ব্যর্থতা, মানবীয় বিবেচনা– এককথায় বারমাসী গীতির সফল ব্যবচ্ছেদ ঘটানোর প্রয়াস পেয়েছেন লেখিকা লুতফুন্নেসা আহমদ এই তাড়নায় যে, যেন তা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে না যায়।

ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এরপরই কুটিরশিল্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবিকই মসলিনশিল্প, তাঁতশিল্প, কাঠশিল্প, মৃৎশিল্প, পাটশিল্প, চামড়াশিল্প, মাদুর ও কার্পেটশিল্প এবং আরো অনেক প্রকার কুটিরশিল্প বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে করেছিল ঐশ্বর্যমণ্ডিত। কালক্রমে এই ইতিহাস মলিন হয়ে বিলুপ্তপ্রায় হলেও 'বেগম'-এর সচেতন লেখিকাগণ বিশেষত অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এই শিল্পের পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হয়েছেন। এই শিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জাহানারা হোসেন তাঁর 'আমাদের কুটিরশিল্প' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, এভাবে–

পাকিস্তান প্রধানতঃ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দেশ। দিন দিন কৃষির উপর যে হারে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে জনসমষ্টিকে কোন বিকল্প উৎপাদন ব্যবস্থায় নিয়োগ করতে না পারলে অর্থনীতির পক্ষে কতদিন এই ক্রমবর্ধমান চাপ বহন করা সম্ভব হবে, তা অনুমান করা শক্ত নয়। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে শিল্পায়নের মাধ্যমে সকল দিক দিয়ে সুষম বিধান করা যায়। কিন্তু ভারী ও বুনিয়াদী শিল্প ব্যাপকভাবে গড়ে তোলা এখনই আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাই আমাদের দেশকে শিল্পায়িত অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে জনসংখ্যার প্রয়োজনানুযায়ী ও আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে সক্ষম এরূপ সুষ্ঠু পর্যায়ে উন্নত করার কাজে কুটির শিল্প এক অতীব

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামো কুটির শিল্প প্রসারের পক্ষে সহায়ক। কারণ কুটিরশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ রয়েছে।[৫৬]

সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কুটিরশিল্পের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং এই শিল্পকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পেশা হিসেবে নার্সিং এবং সাংবাদিকতার কথাও 'বেগম' অনেকাস্থানেই উল্লেখ করেছে। মূলত নারী মমতাময়ী, কল্যাণকামী এবং সমাজে নারীর সেবামূর্তির কথা বিবেচনা করে নার্সিং বৃত্তিতে মেয়েদের এগিয়ে আসার জন্য বারংবার আহ্বান জানানো হয়েছে। মেয়েদের জন্য নার্সিং বৃত্তির যথোপযুক্ততা বর্ণনা করা হয়েছে রুখ স্লিপার এর 'নার্সিং: মেয়েদের জীবিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন মাহমুদা খাতুন। এতে বলা হয় –

জীবনে যদি কেউ এমন কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে চান, যা আজীবন কেবল পুরস্কারই বয়ে আনবে, তবে আমার মতে তার নার্স হওয়া উচিত। কারণ এমন অন্য কোন জীবনের কথা আমার জানা নেই যাতে আজকালকার মেয়েরা একসংগে এতগুলি সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন। কেননা শিক্ষা জীবনের আরম্ভ থেকেই নার্সিং মেয়েদের কর্মব্যস্ত পৃথিবীর আনন্দমুখর মানুষের সাথে এক চিরন্তন ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলে। নার্সিংই একমাত্র জীবন ও বৃত্তি যা ভৌগোলিক সীমা-পরিসীমা পার হয়ে দেশ দেশান্তরে নিয়ে যাওয়া যায়। নার্সিং যেমন মেয়েদেরকে সফল মাতৃত্বের শিক্ষা দিতে পারে আর কোন বৃত্তি পারে না। এই বৃত্তি মেয়েরা জীবনের যে কোন সময়ে গ্রহণ করলেও উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করবে। নার্সিং মেয়েদের সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকের সাথে মেলামেশার সুযোগ দেয় এবং নিত্য নতুন অভিনবত্বের সন্ধান দেয়। এই বৃত্তি মেয়েদের আর্থিক দিক থেকে স্থির নিশ্চয়তা দান করে। সবচেয়ে বড় কথা নার্সিং অপরের সেবা করার সুযোগ দেয়।[৫৭]

নার্সিং বৃত্তি বা শিক্ষকতার ন্যায় সনাতন পেশার পাশাপাশি কারখানার শ্রমিক থেকে শুরু করে সাংবাদিকতা পেশাতেও মেয়েদের আগ্রহী করে গড়ে তুলবার প্রয়াস লক্ষ করা যায় 'বেগম'-এর প্রবন্ধসমূহে। এই পেশায় মেয়েদের উৎসাহিত করতে গিয়ে বলা হয়–

সাংবাদিকতার ন্যায় কল্যাণমূলক উপজীবিকা মেয়েদের আর কিছু হতে পারে না। কারণ লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের দান সর্বাগ্রে। সাংবাদিকদের দায়িত্ব অতি কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত মানবজাতির ভবিষ্যৎ যেভাবে গড়ে উঠছে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা তাঁদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তিটির প্রতি আমাদের মেয়েদের ততটা নজর নেই। সাংবাদিক হতে হলে বি.এ. বা এম.এ. পাস করে উচ্চ শিক্ষিতা হতে হবে এমন কোন কথা নেই। এর জন্য কেবল প্রয়োজন একটি বিশেষ ধরনের অন্তর্দৃষ্টি আর হাতে-কলমে শিক্ষা লাভের জন্য কোন উন্নত ধরনের সংবাদপত্রের সংস্পর্শে থাকা।[৫৮]

যুগের পরিবর্তন, যান্ত্রিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি এবং পারিবারিক জীবনের প্রতি পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন সমস্যা এবং সুযোগের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে

Dhaka University Institutional Repository

চলেছে। ক্রমশ নারীরা বহির্বিশ্বের কর্মজীবনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। গোটা পৃথিবীর মোট শ্রমশক্তির এক তৃতীয়াংশই নারী। কর্মজীবী নারীদের এহেন অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বিবাহিতা মহিলাদের অধিক হারে চাকরিতে যোগদান। বস্তুত পারিবারিক জীবনের আর্থিক টানাপোড়েনের পাশাপাশি পরিবারের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিরও এই অবস্থার একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। তবে অনুঘটক যাই হোক, এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেলেও নারী শ্রমিকদের চাকরিগত বাধা বিপত্তি থেকে গেছে সর্বতোভাবে। কারণ, 'বেগম'-এর ভাষায়–

> *পৃথিবীর খুব কম সংখ্যক দেশেই বর্তমানে মহিলাদের চাকুরীতে পুরুষের সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে অনেক তারতম্য দেখা যায়। চাকুরীর বেতন ও পদোন্নতি এবং সাধারণভাবে শিক্ষা ও বৃত্তিগত ট্রেনিং এর সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রেই এই তারতম্য বেশী করে প্রকাশিত। বিবাহিতা মহিলাদের বেলায় আবার আরও বহুবিধ নতুন সমস্যা বিদ্যমান দেখা যায়। কারণ, তাঁদের চাকুরীগত সুযোগ-সুবিধা অবিবাহিত মহিলা শ্রমিকদের তুলনায় স্বতন্ত্র ধরনের হওয়া প্রয়োজন। কেননা তাঁদের সংসার ও ছেলেমেয়েদের লালন পালনের দায়িত্ব পালন করে চাকুরী করতে হয়। সেজন্য তাঁদের এমন কিছু বিশেষ সুযোগ থাকা উচিত যাতে সংসারের কাজ করেও চাকুরীর দায়িত্ব পালনে তাঁদের কোন অসুবিধা না হয়।*[৫৯]

একটি জাতির সাংস্কৃতিক উপাদানের একটি ব্যাপক অংশ জুড়ে আছে, উক্ত জাতিরাষ্ট্রে নির্মিত চলচ্চিত্র। শিল্পজগতের সর্বত্র এটি বিস্তৃত ও সমাদৃত। কিন্তু কেবলমাত্র বিনোদন মাধ্যম নয়, জাতিগঠনে, সমাজগঠনে চলচ্চিত্রের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে নয়, পাকিস্তানের চলচ্চিত্র নির্মাতারা চলচ্চিত্রকে দেখেছেন ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে – মুনাফা লোটার মাধ্যম হিসাবে। চলচ্চিত্রের পেলব পর্দা দখল করে থাকে বিজাতীয় সংস্কৃতিবোধ সম্পন্ন মারদাঙ্গা, অশ্লীল নাচগানে ভরা উদ্ভট কাহিনীচিত্র। বাস্তব জীবন থেকে পলায়নবাদিতার মোক্ষম দাওয়াই মিলতো চলচ্চিত্রের পর্দায়।[৬০] এ-সম্বন্ধে 'বেগম'-এ বলা হয়–

> *সর্ববিধ অশান্তি, অসুবিধা সত্ত্বেও শ্রান্ত মানুষ চায় একটু আনন্দ। তাই সবচেয়ে স্বল্প ও পরিমিত সময়ের সমন্বয়ে ছায়াচিত্র তারা দেখেন। দেখেন সদাব্যস্ত সাংসারিক মনটাকে একটু চাঙ্গা করবার জন্য (অবশ্য সব দর্শকের কথা নয়)। তাই নোংরা নাচ, কুৎসিৎ সঙ্গীত, অশ্লীল দেহভঙ্গী দেখে তারা একদিকে তৃপ্ত হন। তারাও ভালভাবে এটি জানেন যে, যা তারা পর্দায় দেখবেন তা তারা জীবনে কখনো শুনেননি, দেখা তো দূরের কথা। এবং তাদের সংসারে বা জানা শুনা আত্মীয় বন্ধু মহলে এমন কাণ্ড কখনো হবে না। একি কখনো হয়– মুখে চুনকালি মেখে, ঠোঁটে লাল রং মেখে বেটাছেলের মত সুট পরে জলন্ত সিগারেট টানবে ছবির নায়িকা। পাড়ার ফক্কর ছেলেটি তার বন্ধুকে বললো – বুঝলি তারপর অতবড় ধিঙ্গী মেয়েটা বাপের সামনে গদগদ হয়ে বললো মহব্বৎ কে লিয়ে বাবুজী– এ একটা রূপকথা বা যাদুবিদ্যার মতো। জানি আজগুবি, জানি মিথ্যা তবু শুনি। ঠাকুমার কোলে শুয়ে সেই কোটালপুত্রের গল্প শুনবার মত।*[৬১]

Dhaka University Institutional Repository

চলচ্চিত্র শ্রমজীবী মানুষের আনন্দ লাভের একমাত্র স্থান। তারা সিনেমায় গিয়ে নিজেদের দুঃখ গ্লানি ভুলে পর্দার বুকের নায়ক-নায়িকার আনন্দ ভালবাসার দৃশ্য দেখে আনন্দ পান। ছবির নায়ক নায়িকার সুখে তারা হাসে, দুঃখে তারা কাঁদে। বীরত্বের কোনও ঘটনা দেখলে তারা স্থান-কাল-পাত্র ভুলে চিৎকার করে ওঠে। এমনিভাবে মনের রুদ্ধ আবেগ তারা প্রকাশ করে। সিনেমা হল থেকে যখন তারা বেরিয়ে আসে তখন অনেকখানি শান্ত থাকে তাদের মন কারণ তাদের রুদ্ধ আবেগ মুক্তির পথ পায়। কিন্তু আবেগের এই দিকটিকে নিয়ে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সাধনের খেলায় মাতেন অনেক চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী। তারা দর্শককে বন্য আবেগের খোরাক দিয়ে আরো বেশি বন্য করে তোলার চেষ্টা করেন। কারণ মানুষ বন্য হলে মন্দের দিকেই ছোটে বেশী।[৬২] চলচ্চিত্রে অশ্লীলতার হার দেখে জোবেদা খানম চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন–

> *আমাদের দেশে বর্তমানে যে সকল ছবি তৈরী হচ্ছে তাতে এইসব ব্যবসায়ীর মনের গতি সহজেই বোঝা যায়। এঁরা শুধু চিন্তা করছেন, কি করে তাঁদের একখানা গাড়ীর জায়গায় দুখানা গাড়ী হবে, দুখানা বাড়ীর জায়গায় তিনখানা বাড়ী হবে, কিন্তু একবার ভেবে দেখছেন না তাঁদের এই বিষবৃক্ষের বীজ একদিন ডালপালা মেলে দেশের সমস্ত আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলবে।*[৬৩]

চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ছবি নির্মাণের পেছনে যে উদ্দেশ্যটি সবচেয়ে বেশি কাজ করে তা হলো ব্যবসায়িক সাফল্য অর্থাৎ আর্থিক লাভ। ছবিকে 'মার্কেট' পাইয়ে দেয়া কিংবা 'বক্স হিট', 'সুপার হিট', 'সুপার ডুপার হিট'– ইত্যকার শব্দবন্ধের জন্ম দেয়াতেই পরিচালকের দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে অধিকাংশ সময়। এই তাড়নায় পূর্ব পাকিস্তানে এক সময় বাংলা ছবির পরিবর্তে উর্দু ছবি নির্মাণের হিড়িক পড়ে। যেমন: সৈয়দ আওয়াল ও শিবলী সাদিক পরিচালিত 'বালা', কামাল আহমেদ পরিচালিত 'উজালা', রহমান পরিচালিত 'মিলন', মুস্তাফিজের 'পয়সে', জহির রায়হান পরিচালিত 'সঙ্গম' (পাকিস্তানের প্রথম রঙিন ছবি)। ফতেহ লোহানী'র 'সাতরং', নজরুল ইসলাম পরিচালিত 'কাজল' ইত্যাদি। কিন্তু এইসব চলচ্চিত্রে বাঙালি তার নিজস্ব সংস্কৃতি, আদর্শ জীবন যাত্রার ভাবধারার কোনও মিল খুঁজে পায় না বলে রুচিশীল দর্শকদের মনে একটা ক্ষোভ জমায়। 'বেগম'-এ-বিষয়টি তলিয়ে দেখার চেষ্টা করে–

> *প্রশ্ন জাগে পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্র কেন উর্দূ হবে? আর হলেও তা পশ্চিম পাকিস্তানী মার্কা কেন হবে? এই উর্দূ ছবি তোলার সপক্ষে অনেক পরিচালক বা প্রযোজক যুক্তি দেখিয়ে থাকেন, উর্দূতে ছবি না হলে পশ্চিম পাকিস্তানের মার্কেট পাওয়া যাবে না। শুধু কি তাই? দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য ছবির মধ্যে সব রকমের রস থাকা চাই–আদি, যৌন, বীর, করুণ। এ-প্রসঙ্গে বলা যায়– ছবির কাহিনীর মধ্যে সর্বজন বিদিত আবেদন ও শিল্পবোধ যদি থাকে তাহলে যে কোন ভাষাতে তৈরী ছবিই দর্শকদের মনকে নাড়া দিতে বাধ্য। তার জন্য উগ্র যৌনবোধ দৃশ্যের প্রয়োজন হয় না। যে ধারণা প্রযোজকদের মনে বদ্ধমূল ছিল বাংলা ভাষায় নির্মিত ছবি চলে না, 'দুই দিগন্ত', 'সুতরাং' ও 'অনেক দিনের চেনা'– ছবির সফলতায় আজ তা ভেঙ্গে গেছে।*[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

তবে চলচ্চিত্রের মান বৃদ্ধি করার প্রয়োজনে পশ্চিম বাংলার ছবি আমদানির পক্ষে মত প্রকাশ করেছে 'বেগম'। চলচ্চিত্র শিল্পের আর্থিক স্বার্থ রক্ষায় সরকার পাকিস্তানে পশ্চিম বাংলার চলচ্চিত্র আমদানী নিষিদ্ধ করায় এ-প্রসঙ্গে মতদ্বৈততা প্রকাশ পেয়েছে সাঈদা খানমের লেখায়–

> *এ কথা সত্যি পশ্চিম বাংলা থেকে ছবি আমদানী বন্ধ হওয়াতে ছবির মান বিচার করা আমাদের পক্ষে একটু কঠিন হয়ে গেছে। প্রতিযোগিতা না থাকলে কোন জিনিসই সুন্দর ও সার্থক হতে পারে না । তাছাড়া এখানে অভিজ্ঞ কারিগর, পরিচালকেরও যে অভাব আছে তা অস্বীকার করা যায় না।*[৬৫]

একটি রাষ্ট্রের চলচ্চিত্র উক্ত সমাজ, জাতির জীবন, সংস্কৃতি কৃষ্টিকে ফুটিয়ে তোলে। চলচ্চিত্র সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্র সেই ভূমিকা থেকে অনেকখানিই সরে এসেছিল। বরং অন্ধ অনুকরণের তাড়নায় পরিচালকরা নিজস্ব সংস্কৃতির পরিবর্তে বিভিন্ন দেশীয় সংস্কৃতির এক মিশেল উপহার দেন। ছবিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পোশাক পরিচ্ছদের উদাহরণ দিয়েই জোবেদা খানম বিষয়টি স্পষ্ট করেন–

> *আমাদের দেশের ছবির পোশাক পরিচ্ছদ নানা দেশের পোশাকের এক অপুর্ব খিচুড়ী। নানা দেশের ছবি দেখেছি, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদের এমন খিচুড়ী আর কোথাও দেখি নাই। স্প্যানিশ, ইংলিশ, জাপানী সব মিলে আমাদের দেশের ছবির নায়ক নায়িকার পোশাক তৈরী হয়েছে। অন্য দেশের লোক আমাদের দেশের ছবি দেখলে আমাদের সমাজ জীবন সম্বন্ধে কোন ধারণাই গড়ে তুলতে পারবে না। আমরা কি কৃষ্টির দিক দিয়ে এতই নিকৃষ্ট।*[৬৬]

গণমাধ্যমের অন্যতম প্রধান কাজ– 'টু এডুকেট'– অর্থাৎ শিক্ষার বাহন হিসাবে কাজ করা। এই শিক্ষা যে স্কুল কলেজের ক্লাশরুম শিক্ষার অনুরূপ হবে তা নয়। এটি কাজ করবে আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিস্তারের বাহন হিসাবে। চলচ্চিত্রকেও এই বাহন হিসেবে দেখতে চেয়েছে 'বেগম'। 'বেগম'– এর ভাষায়–

> *আন্তর্জাতিক শিক্ষা বিস্তারের বাহন হিসেবে ছায়াচিত্রের সমকক্ষ কোন প্রতিষ্ঠানই নাই– একথা বল্লে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। গণতন্ত্র সম্মত জীবন যাত্রা নির্বাহ যে কিভাবে করতে হয়, সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে ছায়াচিত্র বাস্তবিকই অতুলনীয়। সাধারণ মানুষের নিকট আমোদ প্রমোদ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে ছায়াচিত্র আশা আকাঙ্ক্ষার বাণী বয়ে আনে এবং শিক্ষক ও পথ প্রদর্শকের কাজও করে থাকে। সভ্য ও বিশ্বজনীন আদর্শের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠান মানুষের রুচি ও কলা শিল্প বোধেরও উন্নতি সাধন করে থাকে।*[৬৭]

প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের চলচ্চিত্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত– এই আলোচনার পূর্বে বিবেচনা করে দেখা উচিত পাকিস্তানে চলচ্চিত্রের অবস্থা কী? একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়– বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসের আলোচনায় পাকিস্তানের চলচ্চিত্রের উল্লেখ খুব কম ক্ষেত্রেই এসে থাকে। বরং

Dhaka University Institutional Repository

অবধারিতভাবে এসে যায় ভারতীয় চলচিত্রের প্রসঙ্গ। মূল কারণ আর কিছু নয়— ধর্ম। এ-প্রসংগে 'বেগম'-এর ব্যাখ্যা—

> *যারা সভ্যতা ও প্রগতির দিকে খুব বেশী অগ্রণী হয়েছেন, তারা বাণীচিত্রকে সূক্ষ্ম শিল্প বলে স্বীকার করেছেন। আমেরিকা, ইংল্যান্ড প্রভৃতি অত্যাধুনিক প্রগতিবাদী দেশে তাই এর প্রচলন অনেক বেশী। ভারতও এই শিল্পরুচির পরিচয় দিয়েছে সর্বতোভাবে। কিন্তু মুসলমান সমাজের শিল্পবোধ সূক্ষ্ম হলেও বাণীচিত্রকে তারা শিল্প বিকাশের পথে প্রধান্য দিয়েছে অনেক কম। এর কারণ নির্ধারণ করা খুবই সহজ – মুসলমানেরা তাদের তাহজীব ও তমদ্দুনের দোহাই পেড়ে গোঁড়ামীবশতঃ বহুক্ষেত্রে আধুনিক শিল্পরুচিকে ধর্মবিরোধী বিবেচনা করেছিল। স্বল্প শিক্ষিত মানুষের ধর্মের দোহাই পাড়া অন্ধ অপপ্রচার বহুক্ষেত্রেই মুসলমানকে তার রুচি বিকাশের পথে বহুদূর পিছিয়ে দিয়েছিল।*[৬৮]

পাকিস্তানে চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার প্রথম পর্যায়ে 'পাকিস্তানে চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা উচিত কি না'– এটা নিয়ে এক ধরনের বিতর্ক গড়ে ওঠে। একপক্ষ পাকিস্তানে চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার পক্ষে এবং অপর পক্ষ বিপক্ষে মত দেয়। বিপক্ষপন্থীদের সবচেয়ে বড় যুক্তি 'ধর্ম' তথা 'শরীয়ত'। আর পক্ষবাদীদের যুক্তি 'প্রগতি'। এহেন পরিস্থিতিতে প্রকৃত অবস্থান কী হওয়া উচিত সে-বিষয়ে 'বেগম' তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছে এভাবে—

> *এ কথার সঠিক ভাবার্থ দেখার আগে আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে ইসলাম কি পরিমাণে গৃহীত হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। আমার বিশ্বাস এ-সমাজের খুব কম লোকই ইসলামের আদর্শকে গ্রহণ করতে পেরেছেন। যাঁরা ধর্মের নাম করে শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধিকে নিতান্ত অমূলক ভেবেছেন তাঁরা ইসলামের আসল ঔদার্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে আশ্রয় করেছেন গোঁড়ামীকে। ইসলাম কোন দিনই গোঁড়ামীর প্রশয় দেয় না বরং জাতির অগ্রগতির জন্য এবং জাতির সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য ইসলাম প্রায় সবসময় স্বাধীনতা দান করেছে। শিক্ষা ও উদারনৈতিক জ্ঞান লাভের জন্য যে কোন দেশের যে কোন ভাষা শিক্ষার বিধান ইসলামে আছে। গণশিক্ষা ও তার প্রসারতার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিবাহক হলো বাণীচিত্র। কাজেই আসল ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মানুষের যে শিক্ষার প্রয়োজন তা লাভ করা সহজ হয়ে উঠবে বাণীচিত্রের মাধ্যমে। আজ পাকিস্তান অর্জন করার পর আমাদরে সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে তোলাই হবে আমাদের আসল ধর্ম।*[৬৯]

সেক্ষেত্রে পরবর্তী যে প্রশ্নটি এসেছে তা ছিল পাকিস্তানের বাণীচিত্রের বিষয় কী হবে? নিছক বিনোদননির্ভর নাচগান ভরপুর অবাস্তবভিত্তিক ছবি না অন্যকিছু। 'বেগম' মনে করে—

> *এ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হলো – সমাজ, বাংলার তথা বিশ্বের মুসলিম দুনিয়ার দরবারে আমাদের সমাজের আসন কোনখানে সেকথা জানিয়ে দেবে আমাদের চিত্র। সমাজের আলেখ্য নিয়ে আমাদের সাধারণ ত্রুটি বিচ্যুতি– অগ্রগতির পথে আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনা সবকিছু জানিয়ে*

Dhaka University Institutional Repository

দেবে আমাদের সামাজিক বাণীচিত্র। ছোটদের মধ্যে যাতে কারে স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্ববোধ জেগে উঠে সেজন্য আমাদের অতীতের ব্যঞ্জক কাহিনীর পটভূমিকায় ছবি করতে হবে।[৭০]

চলচ্চিত্রকে সমাজের দর্পণ হিসেবে মেনে নিয়েই সমাজ গঠন, সমাজ-সংস্কারে চলচ্চিত্রের প্রকৃত ভূমিকা উপলব্ধি করে, সেই ভূমিকা নিশ্চিত করতে চেয়েছে 'বেগম'। এ-কারণেই সামাজিক বাস্তবতা তুলে ধরে সামাজিক ছবি নির্মাণ করার পাশাপাশি ছোটদের উপযোগী চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতিও বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রটিতে পাশ্চাত্যের দেশসমূহ অনেক আগেই পদার্পন করলেও সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তান ছিল কিছুটা অমনোযোগী। মূলধারার চলচ্চিত্র অনেকবেশী বানিজ্য নির্ভর হওয়ায় ছোটদের এর মধ্য দিয়ে নৈতিক অধঃপতন ঘটার সুযোগ তৈরি হয়। তাই 'বেগম' চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রশ্নে ছোটদের দিক বিবেচনায় অনেক বেশি সতর্ক ছিল।

চলচ্চিত্র সংক্রান্ত আর একটি ক্ষেত্রে ছিল 'বেগম'-এর সতর্ক ও বিবেচনা প্রসূত দৃষ্টি। এটি ছিল চলচ্চিত্রের অভিনেত্রীর প্রসঙ্গ। ধর্মীয় যে দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানে চলচ্চিত্র নির্মাণের বিষয়টি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল, একই দৃষ্টিকোণ থেকে চলচ্চিত্রাভিনেত্রীরা ছিলেন অনেকটাই অচ্ছ্যুৎ শ্রেণীর। তাদের কোনও সামাজিক মর্যাদা ছিল না। এঁদের সৃষ্টকর্ম দেখে মানসিক তৃপ্তি ঘটলেও বাস্তবজীবনে এদের প্রতি এক ধরনের কটাক্ষপাত ছিল। বেগম রেবেকা আখতার বানু 'সমাজ ও চলচ্চিত্র শিল্পী' শীর্ষক প্রবন্ধে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে বলেন—

চলচ্চিত্রশিল্পীরা বিশিষ্ট শিল্প স্রষ্টা— তাঁদের দায়িত্ব অন্য সাধারণের দায়িত্বের চেয়েও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এঁরা বিশেষ সম্মানের অধিকারী। কিন্তু সমাজের মধ্যে যাঁরা অভিজাত বলে দাবী করেন তাদের মন এইসব শিল্পীদের প্রতি অনেকটা দুর্বল। এঁদের যে কোন সামাজিক জীবন থাকতে পারে তা তারা মানতেই চান না। বস্তুত কুটিল ও অশ্লীল কটাক্ষপাত করেন। সিনেমা হলে গিয়ে এই অভিজাতরা হয়তবা খানিকটা প্রশংসার দৃষ্টি দিয়েই দেখেন শিল্পীদের, কিন্তু সিনেমার বাইরে অবসর সময়ে শিল্পীদের শিল্প থেকে পৃথক করে নিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি অহেতুক মিথ্যা কলংক লেপন করতেও কুণ্ঠিত হন না। শিল্পের প্রশংসা তাঁরা করে থাকেন কিন্তু শিল্পীকে সম্মান দিতেই যেন তাঁদের যত অমত।[৭১]

চলচ্চিত্র শিল্পীদের প্রকৃত অবদান তুলে ধরে তিনি আরো বলেন—

চলচ্চিত্র শিল্পীদের জীবনে কতোখানি ত্রুটি বিচ্যুতি আছে এটাই তাদের পক্ষে বড় কথা নয়– তাঁদের পক্ষে যা সবচেয়ে বড় কথা সে হলো এই যে, একজন চলচ্চিত্র শিল্পী তাঁর শিল্পজগৎকে কতখানি দান করতে পেরেছেন এবং তাঁর সে দানের গুরুত্ব কোথায়? কোন চলচ্চিত্র শিল্পী যদি তাঁর নিজস্ব টেকনিকের দ্বারা মানুষের মনকে তাঁর শিল্পের প্রতি আবিষ্ট করতে পারেন, তাহলে সেইখানেই হবে তাঁর জিৎ এবং তাঁর সমস্ত পরিশ্রম সার্থকতা লাভ করবে।[৭২]

তবে লেখিকা চলচ্চিত্রাভেনেত্রীদের নাম পরিবর্তনের প্রবণতার সমালোচনা করেছেন। সাধারণত দেখা যায় পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে একটি মেয়ে নিজস্ব যে নামে পরিচিত সে যখন অভিনেত্রীরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন সেই নাম পরিবর্তন করে ফেলে। এই প্রবণতা হিন্দু

Dhaka University Institutional Repository

অভিনেত্রীদের চেয়ে মুসলিম অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে বেশি লক্ষ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এর পেছনে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিও কাজ করে। পুরো বিষয়টির সমালোচনা করে বেগম রেবেকা আখতার বানু বলেন–

> *বাঙালি মুসলিম মহিলারা নিজেদের আসল নাম বদল করে অন্য নামে অভিনয় করছেন। এর কারণ শুধু যে চিত্র সমাজ তা নয়, বরং ব্যবসার খাতিরেও বহুক্ষেত্রে নাম পরিবর্তন করতে হয়েছে। কিন্তু নাম বদলের রহস্যটা যাই হোক না কেন, আজকের দিনে এরূপ ব্যবসার ফিকিরকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায় হবে। যে কোন সম্প্রদায়ের শিল্পাশ্রয়ী একটি প্রতিভাদীপান্বিতা রমনী আজীবন আপন নাম প্রচ্ছন্ন রেখে শিল্পসৃষ্টি করে যাবেন– এ যুগে এরূপ চিন্তা করাও যেন কেমন অস্বস্তিকর। দেশ অগ্রগতির পথে যত বেশী সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে ততো দেশবাসীদের মন স্বচ্ছ ও সুন্দর হয়ে ওঠে– কাজেই এ যুগে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অভিনেত্রীরা যদি তাঁদের আসল নামে অবতীর্ণ হন তাহলে আমার মনে হয় ব্যবসা সম্পর্কিত ব্যাপারে কোন ক্ষতির সম্ভবনা থাকবে না। অভিনেত্রীরা যুগের প্রগতিকে সৃষ্টি করেন। অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মনে নতুন আলোর ঝলকানি নিয়ে আসেন শিল্পীরা– কাজেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের পথে তাদের দায়িত্ব কম নয়।*[৭৩]

একটি দেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে লেখক সাহিত্যিকদের রচিত বিভিন্ন সৃষ্টিশীল রচনা (কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ছড়া, নাটক ইত্যাদি)। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এই সৃষ্টিশীল রচনা আদর্শগতভাবে এক সন্ধিক্ষণের সম্মুখীন হয়েছিল। আদর্শের দ্বন্দ্বে সাহিত্যিকরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন– ইসলামি আদর্শ এবং সাম্যবাদ। যারা ইসলামি আদর্শপন্থী তাঁদের মতে খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলকে ফিরিয়ে আনতে পারলেই মানুষের জীবনের মান উন্নত হবে। তাঁরা মনে করেন, ইসলাম যা তাকে হারিয়ে বসে মানুষ মেকী কুসংস্কারকে ধর্মের আবরণে ঢেলে নিয়ে লোককে ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে। ইসলামের নাম করে, তারই দোহাই দিয়ে সমাজ তথা মানুষের ব্যষ্টি জীবনের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করছে। অপর পক্ষে প্রগতিপন্থীরা মনে করেন, ধর্মকে যে কোনও পরিবেশে জিইয়ে রাখলে সমাজের অগ্রগমণ ব্যাহত হবে– কারণ কুসংস্কার ধর্মের অনুসারী, তাছাড়া ধর্ম মানুষকে কর্মের পথে আহ্বানে না জানিয়ে ভাবের রাজ্যে আত্মস্থ করে। আর ধর্মের নামেই মানুষের সমষ্টি ও ব্যষ্টিগত জীবনের সবচেয়ে বেশি বিপর্যয় আনা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি ধারার চিন্তাই কিছুটা চরম। মাহমুদা খাতুন 'সাম্প্রতিক কাব্যধারার ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন—

> *আমাদের আলোচ্য দুটি আদর্শেরই মূল উৎস কিন্তু এক– উগ্র জীবনবোধ। মানুষ যে চরম বঞ্চনার রাজ্যে বাস করছে মানুষের সত্যিকার অধিকার যে নানাভাবে পিষ্ট হচ্ছে– এ পরম সত্যকে উভয় ক্ষেত্রেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সংঘাত বেধেছে মানুষের মুক্তির উপায় নিয়ে। কিন্তু মুক্তি যে পথেই আসুক না কেন, এই দুই আদর্শের কবিগোষ্ঠি আজ যে গোঁড়ামির পূজারী তাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। ইসলামপন্থীরা কবিতা লিখছেন একেবারে খাস আরবের জীবনধারা নিয়ে, আরবের খেজুর বন, শিরীন চাঁদ, মরুর বালুকা, উটের কাফেলা ছাড়া অন্য কিছুই তাদের চোখে পড়ে না। আবার যারা সাম্য বিশ্বাসী তারা কবিতা লেখেন কোরিয়া রণক্ষেত্রের কোন অজ্ঞাত নায়ককে নিয়ে। অগ্নিকোণের সিঁদুর মেঘকে নিয়ে কিংবা ভাবীকালের*

Dhaka University Institutional Repository

কোন নায়িকার চোখের আগুন নিয়ে। অথচ এই উভয় ধারার কবিদেরই মনে রাখা জরুরী যে আমাদের কাব্য সাহিত্যের বিষয় হওয়া উচিত একেবারেই আমাদের নিজস্ব সমাজব্যবস্থা। এই সমাজব্যবস্থার উদাহরণ দিয়েই মুক্তির উপায় খোঁজার আদর্শ বের করা উচিত।[৭৪]

সাহিত্যের আদর্শ যাই হোক, বিভাগোত্তরকালে পূর্ববাংলার সাহিত্যের অগ্রযাত্রা যতটুকু দ্রুত হওয়ার আশা এবং সম্ভাবনা ছিল প্রকৃত অগ্রগতি সে তুলনায় অনেকটাই কম ছিল। এক্ষেত্রে পুরুষ সাহিত্যেকদের তুলনায় মহিলা সাহিত্যিকরা পিছিয়ে ছিলেন অনেক বেশী। নানাবিধ বাধা বিপত্তি তাদের এই এগিয়ে যাওয়ার রাশ টেনে ধরে যদিও অন্তঃত সাহিত্যের জগতে নারীসাহিত্যিক, পুরুষ সাহিত্যিক এ-জাতীয় ভেদরেখা টানার পক্ষপাতী অনেকেই নন, হয়তো উচিতও নয়। যেমন অধ্যাপিকা আফিয়া খাতুন বলেন–

মহিলা সাহিত্যিকদের এ-ব্যাপারে পিছিয়ে পড়ার কারণ ও তাদের বর্তমান অসুবিধাগুলোর কথাই আমরা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এ-কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, সাহিত্য ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষ বিচার করে তাকে ভাগ করা যায় না। এ-কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, 'আঙ্কল টম্‌স কেবিন' মেয়ের লেখা হলেও তার আবেদন সার্বজনীন। পার্ল বাক এর যে কোন লেখা মেয়ে পুরুষ দুই জনকেই আনন্দ দিচ্ছে। পার্ল বাক যে পুরুষ নন মহিলা আবার নেসাদ বানুও যে মহিলা নন পুরুষ এ-কথা তাদের সাহিত্য পড়ে জানার উপায় নেই। কাজেই বর্তমানে যে অসুবিধার মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে চলতে হচ্ছে তা শুধু মহিলা সাহিত্যিকদের জন্য নয়– সব সাহিত্যিকদের জন্যই।[৭৫]

এরপরও সমাজে লেখিকারা আছেন, নারীদের জন্য, নারীদের কথা বলার জন্যই লেখিকাদের স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে হয়। আর স্বতন্ত্রভাবে লেখিকাদের কথা বলতে গেলেই দেখা যায় হাজারো ব্যক্তিগত, সামাজিক সমস্যা তাদের সাহিত্যচর্চা কণ্টকাকীর্ণ করে রাখে। যে কারণে প্রতিশ্রুতিশীল হওয়া সত্ত্বেও অনেককেই লেখা ছেড়ে দিতে হয়, এমনকি পূর্ব থেকেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য ক্ষেত্রে আশানুরূপ চর্চা করতে পারেন না। উপযুক্ত পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা থাকলে সাহিত্যিক তার মানসিক স্বচ্ছতা বজায় রেখে সাহিত্যসেবা করে যেতে পারেন– বাঙালির সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে যার নিতান্ত অভাব। অধ্যাপিকা আফিয়া খাতুন এর ভাষায়–

'রান্নার পরে খাওয়া, খাওয়ার পরে রান্না'র দৈনন্দিন জীবনের কর্মব্যস্ততার সংকীর্ণতম পরিসরে নিরবিচ্ছিন্ন সাহিত্য সেবার তৃপ্তি পাওয়ার মতো ভাগ্য আমাদের দেশের ক'টি ভাগ্যবতীর জীবনে মিলবে? বাড়ীতে স্বামী পুত্র কন্যার সেবা করে, শ্বশুর শাশুড়ী আত্মীয় পরিজনের মন যুগিয়ে শত কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনা করার অবসর পাওয়ার আশা করাই অন্যায়, তাছাড়া আমাদের এমন একটি প্রতিষ্ঠান বা এমন একটি আয়তনিক কর্মশালা এখানে নেই যেখানে লেখিকারা দু'দণ্ড নিয়মিতভাবে একজোট হয়ে বসে সাহিত্য আলোচনা করতে পারেন। আমাদের চারধারে খুঁজলে এমন একটি লাইব্রেরী বা পাঠচক্র কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে লেখিকারা দিনান্তে অন্তত একবারও স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যিকদের মহৎ রচনার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পেতে পারেন।[৭৬]

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালির সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক মনোভাবনারও কথা যদি বলা হয়, তবে অবধারিতভাবেই ভাষা'র প্রসঙ্গ এসে যায়। আপাতদৃষ্টিতে ভাষা যে কোনও জাতির সংস্কৃতির গণ্ডীবদ্ধ হলেও বাঙালির ভাষার প্রশ্নে এটি শুধু সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নয়, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ করে। কেননা বাঙালির ভাষাচেতনার সঙ্গে যুক্ত তার স্বাধিকারের চেতনা, তার রাজনৈতিক অধিকারের ইতিহাস। পৃথিবীতে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতিসমূহের মধ্যে নিঃসন্দেহে বাঙালি অন্যতম। কেননা ভাষার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ে বাঙালিকে জীবন দিতে হয়েছিল। একটি স্বাধীন দেশের জাতীয় পতাকা, জাতীয় পোশাক, জাতীয় প্রতীক ইত্যাকার সব জাতীয় বৈশিষ্ট্য নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় যখন ভাষার পর্ব এলো তখনই সমস্যা শুরু হল। বস্তুত, পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এসেছিল ধর্মের ভিত্তিতে। ধর্মের যুক্তিতেই পাকিস্তানের দুটো অংশের (পূর্ব ও পশ্চিম) সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এক রাষ্ট্রভুক্ত হলো। কিন্তু এই ধর্মীয় ঐক্য বেশীদিন দুটো অংশের কৃত্রিম এই বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারল না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে– এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই উভয় অংশের ভাঙনের সূত্রপাত।

সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসেবে বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্যতা রাখলেও পাকিস্তানি শাসকচক্র এই যুক্তি না মেনে, তাদের নিজস্ব ভাষা উর্দুকে চাপিয়ে দিতে চাইলো। পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজ তাদের লেখনীর মধ্য দিয়ে এর তীব্র প্রতিবাদ জানালো। ছাত্র জনতা প্রতিবাদ জানালো। পরিণতিতে বাঙালি পেলো একুশে ফেব্রুয়ারি। এ-দিনের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন লেখনীতে। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখে দিনটি পালিত হয় গভীর মর্যাদায়। এ-প্রসঙ্গে দিলারা সিদ্দিকা বলেন–

> *পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত বহু আন্দোলন হয়েছে। স্বাধীনতার দাবীতে, অন্ন বস্ত্রের দাবীতে, অত্যাচার প্রতিরোধের আওয়াজে বহু নিপীড়িত জাতি বুকের রক্ত দিয়ে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। কিন্তু একদিক থেকে এ-সকল আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্যে একুশ অনন্য, একুশের স্থান একক। পৃথিবীর কোন দেশেই বোধহয় জাতীয় ভাষার মর্যাদা রাখতে গিয়ে জাতীয় সরকারের গুলি আর বেয়নেটের সামনে তরুণ বীরদের বুক পেতে দিতে হয়নি। এ আঘাত দেশের কোন দল বিশেষ বা মত বিশেষের রাজনৈতিক দাবীর প্রতি নয়, দেশের আপামর জনসাধারণের সাংস্কৃতিক মর্যাদার মর্মমূলে এ আঘাত হানা হয়েছে।*[৭৭]

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে উর্দু ও বাংলা ভাষা নিয়ে যে বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছিল তাতে বাংলা'র পক্ষ সমর্থন করে মোহসেনা ইসলাম 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন–

> *পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ শিক্ষিতের হার আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাদের ভিতর অধিকাংশই অল্প বা অর্ধশিক্ষিত। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের যে কোন দোষ-ত্রুটি, অভাব-অভিযোগ জানাতে হলে এমন একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজন যা দ্বারা দেশের জনগণ অনায়াসেই রাষ্ট্রের সম্মুখে তাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পারে এবং তারাও তা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাই তাদের কাছে সাধারণ ভাষা। উর্দুর কথাতো আসতেই পারে না।*[৭৮]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসংকেত

১. *সোনিয়া নিশাত আমিন, নারী ও সমাজ, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) তৃতীয় খণ্ড- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,(সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৭৮*

২. *প্রাগুক্ত।*

৩. *তাহমিনা আলম, বাংলার সাময়িক পত্রে বাঙালী মুসলিম নারীসমাজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১০০*

৪. *প্রাগুক্ত।*

৫. *বদরুদ্দীন উমর, একুশে ফেব্রুয়ারি ও সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণ, সংস্কৃতির সংকট, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৭৯*

৬. *রেবেকা সুলতানা চৌধুরী, নারীর আজাদী ও মুসলমান সমাজ, সাপ্তাহিক বেগম, ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ৩রা অক্টোবর, ১৯৪৮, পৃ. ৫*

৭. *প্রাগুক্ত।*

৮. *রেবেকা সুলতানা চৌধুরী, নারীর সম-অধিকার দাবী, সাপ্তাহিক বেগম, ৪র্থ বর্ষ ১৭তম সংখ্যা, ২৫শে মার্চ, ১৯৫১, পৃ. ১৭*

৯. *মিরাতুল ফাতেমা, সমাজ বিবর্তন ও নারীর জীবিকা, সাপ্তাহিক বেগম, ১৮ শ বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৬৫, পৃ. ৪*

১০. *মায়াগুপ্তা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী, সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ৩রা আগস্ট, ১৯৪৭, পৃ. ৪*

১১. *বেগম সুফিয়া কামাল, আমাদের কথা, সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ ২য় সংখ্যা, ৩রা আগস্ট, ১৯৪৭, পৃ. ৬*

১২. *প্রাগুক্ত।*

১৩. *হাজেরা খাতুন, মুসলিম নারী ও পর্দাপ্রথা, সাপ্তাহিক বেগম, ২য় বর্ষ, ১৮তম সংখ্যা ২রা জানুয়ারি, ১৯৪৯, পৃ. ৬*

১৪. *পর্দাপ্রথা, ইন্ডিয়ান উইমেনস জার্নাল হইতে অনুদিত সাপ্তাহিক বেগম প্রথম বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮, পৃ. ৭*

১৫. *বেগম সেলিনা আহমদ পাকিস্তানে নারীসমাজের মর্যাদা, সাপ্তাহিক বেগম, স্বাধীনতা সংখ্যা, ১৪ ই আগস্ট, ১৯৬৫, পৃ. ২৫*

১৬. *নারী ও পর্দাপ্রথা, সাপ্তাহিক বেগম, ২য় বর্ষ, ১৮তম সংখ্যা ২রা জানুয়ারি ১৯৪৯, পৃ. ৬*

১৭. *সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ, ৩০তম সংখ্যা, ১৪ই মার্চ ১৯৪৮, পৃ. ৪*

১৮. *বেগম মনোয়ারা মাহবুব, শিক্ষিতা নারীর প্রয়োজন, সাপ্তাহিক বেগম, ২য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ৩ অক্টোবর, ১৯৪৮ পৃ. ১৪*

১৯. *খয়রুন্নেছা, আমাদের শিক্ষা, সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৪৭ পৃ. ৮*

২০. *মাহমুদা খাতুন, নারীশিক্ষা ও পূর্ব পাকিস্তান, সাপ্তাহিক বেগম*

২১. *কাজী জাহান আরা খাতুন এম.এ. পাকিস্তানে নারীদের দায়িত্ব, সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৩রা আগস্ট, ১৯৪৭, পৃ. ১*

২২. *মায়া গুপ্তা, প্রাগুক্ত।*

২৩. *বেগম নাজমা খাতুন, শিক্ষিতা মহিলাদের দরবারে, সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০ই আগস্ট, ১৯৪৭, পৃ. ১২*

২৪. *প্রাগুক্ত, বেগম নাজমা খাতুন।*

Dhaka University Institutional Repository

২৫. *মায়মুনা পারভেজ, মহিলাদের কলেজীয় শিক্ষার গুনাগুন, সাপ্তাহিক বেগম, ৭ম বর্ষ, ৪২তম সংখ্যা, ৯ই জানুয়ারি, ১৯৫৫, পৃ. ৪*

২৬. *দীনিতা রহমান, জাতীয় জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়, সাপ্তাহিক বেগম, ২২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮, পৃ. ৫*

২৭. *তাফিকুন্নেসা করিম, মেয়েদের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি, সাপ্তাহিক বেগম, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ২৩ অক্টোবর, ১৯৪৯, পৃ. ১৪*

২৮. *মাহমুদা খাতুন, সংসারের সফলতার পেছনে গৃহিনীর প্রেরণা, সাপ্তাহিক বেগম ১৭বর্ষ ১৯শ সংখ্যা, ১৭ই মে, ১৯৬৪ পৃ. ১৫*

২৯. *কামরুন নেসা, মুসলিম বাংলায় নারী আন্দোলনের ধারা, সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০ই আগস্ট, ১৯৪৭, পৃ. ৪*

৩০. *নাজমা বেগম, প্রগতি ও বাঙ্গালী মুসলিম নারী, সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ, ৩৪শ সংখ্যা, ১১ই এপ্রিল, ১৯৪৮, পৃ. ৪*

৩১. *প্রাগুক্ত।*

৩২. *জয়শ্রী বসু, সভ্যতার বিড়ম্বনা, সাপ্তাহিক বেগম প্রথম বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪৮, পৃ. ৪*

৩৩. *রেবেকা সুলতানা চৌধুরী, নারীশিক্ষা ও রাষ্ট্রে অধিকার, প্রথমবর্ষ ৩২শ সংখ্যা, ২৮শে মার্চ, ১৯৪৮, পৃ. ৭*

৩৪. *ভিক্ষাবৃত্তি- একটি সামাজিক সমস্যা, নূরুন নাহার, সাপ্তাহিক বেগম, স্বাধীনতা সংখ্যা, ১৪ই আগস্ট, ১৯৬৪, পৃ. ৩০*

৩৫. *চিঠি পত্র বিভাগ, সাপ্তাহিক বেগম, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯, পৃ. ১৮*

৩৬. *কাজী বুলবুল আখতার ছবুর, পাকিস্তানের যৌতুক প্রথা, সাপ্তাহিক বেগম, ১১শ বর্ষ, ৩৪শ সংখ্যা, ২৬শে অক্টোবর, ১৯৫৮*

৩৭. *প্রাগুক্ত।*

৩৮. *মোশফেকা মাহমুদ বি.এ. আমাদের সমাজে পর্দাপ্রথা, সাপ্তাহিক বেগম, ৭ম বর্ষ, ৩৪শ সংখ্যা, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৪, পৃ. ৭*

৩৯. *কাজী জাহানারা বেগম, ইসলাম ও বহুবিবাহ, সাপ্তাহিক বেগম, ৮ম বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা ২৮শে আগস্ট, ১৯৫৫, পৃ. ১৩*

৪০. *কাজী জাহানারা বেগম, ইসলামে বিবাহ প্রথা, সাপ্তাহিক বেগম, ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৪৮ পৃ. ৫*

৪১. *বেগম শামসুন নাহার করিম, ইসলামে মেয়েদের বিবাহের সঠিক বয়স, সাপ্তাহিক বেগম, ১৩ বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬০, পৃ. ৪*

৪২. *বেগম শামসুন নাহার করিম, প্রাগুক্ত*

৪৩. *বেগম, ইসলামে বিবাহ প্রথা, সাপ্তাহিক বেগম, ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৪৮, পৃ. ৪*

৪৪. *বেগম ফাতেমা রহমান, পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা সমস্যা, সাপ্তাহিক বেগম, ৯ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৮ই এপ্রিল, ১৯৫৬, পৃ. ৪ – ৫*

৪৫. *বেগম ফাতেমা রহমান, প্রাগুক্ত।*

৪৬. *অধ্যাপিকা শামসুন নাহার, জনসংখ্যা সমস্যা ও আমাদের ভবিষ্যত, সাপ্তাহিক বেগম , ১৮শ বর্ষ ৩৪ শ সংখ্যা, ২২শে আগস্ট, ১৯৬৫, পৃ. ৪*

৪৭, *মিসেস জাহানারা মুন্সী, জন্মনিয়ন্ত্রণ ও সুখী পরিবার গঠন, সাপ্তাহিক বেগম, ১১শ বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৫৮, পৃ. ১৪*

৪৮. *বেগম সেলিনা আহমদ, জাতীয় সঞ্চয় আন্দোলনে নারীর ভুমিকা, সাপ্তাহিক বেগম, ১৯ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ১০ই জুলাই, ১৯৬৬ পৃ. ৫*

Dhaka University Institutional Repository

৪৯. *প্রাগুক্ত।*

৫০. *প্রাগুক্ত।*

৫১. *পারভীন হাসান, স্থাপত্য ও চিত্রকলা, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) ৩য় খণ্ড,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, পৃ. ৬১৫*

৫২. *ওয়াকিল আহমদ, লোকসাহিত্য, বাংলাদেশের ইতিহাস (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫০*

৫৩. *অধ্যাপিকা শিপ্রা দত্ত, চাটগাঁর লোকসঙ্গীতে বিরহ, সাপ্তাহিক বেগম, ১২শ বর্ষ, ৪০শ সংখ্যা, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৫৯, পৃ. ৪*

৫৪. *অধ্যাপিকা শিপ্রা দত্ত, প্রাগুক্ত।*

৫৫. *মিস খালেতুন বেগম, পূর্ব পাকিস্তানের লোকনৃত্য, সাপ্তাহিক বেগম, ১২শ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, ১৭ই মে, ১৯৫৯, পৃ. ৪*

৫৬. *জাহানারা হোসেন, আমাদের কুটির শিল্প, সাপ্তাহিক বেগম, ১২শ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ১৪ই আগস্ট, ১৯৫৯, পৃ. ১০*

৫৭. *রুথ স্লীপার নার্সিং, মেয়েদের জীবিকা, অনুবাদ মাহমুদা খাতুন, সাপ্তাহিক বেগম*

৫৮. *ফাতেমা জোহরা, মহিলাদের বৃত্তি হিসাবে সাংবাদিকতা, সাপ্তাহিক বেগম, ১২শ বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৯, পৃ. ১২*

৫৯. *পরিবর্তনশীল বিশ্বে ক্রমবর্ধমান নারী শ্রমিক, সাপ্তাহিক বেগম , ১৭শ বর্ষ ২৭ শ সংখ্যা, ১২ই জুলাই, ১৯৬৪*

৬০. *তানভীর মোকাম্মেল, চলচ্চিত্র, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ. ৫৭*

৬১. *ভারতীয় ছবি সম্পর্কে, সাপ্তাহিক বেগম, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৭ই মে, ১৯৫৩, পৃ. ১৬*

৬২. *জোবেদা খানম, আমাদের সমাজ ও চলচ্চিত্র, সাপ্তাহিক বেগম, স্বাধীনতা সংখ্যা, ১৪ ইং আগস্ট, ১৯৬৫, পৃ. ৫৬*

৬৩. *জোবেদা খানম, প্রাগুক্ত।*

৬৪. *ঢাকার ছায়াছবি, সাঈদা খানম, সাপ্তাহিক বেগম, ১৭শ বর্ষ ৩৩শ সংখ্যা, ২৩শে আগস্ট, ১৯৬৪, পৃঃ১৮*

৬৫. *সাঈদা খানম, প্রাগুক্ত।*

৬৬. *জোবেদা খানম, প্রাগুক্ত।*

৬৭. *হাসনু, শিক্ষা বিস্তারের ছায়াছবি, সাপ্তাহিক বেগম, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখা, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮*

৬৮. *বেগম রেবেকা আখতার বানু, বাণীচিত্র ও মুসলমান সমাজ, সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৩রা আগস্ট, ১৯৪৭, পৃ. ১৪*

৬৯. *বেগম রেবেকা আখতার বানু, পাকিস্তানের বাণীচিত্র, ৮ই এপ্রিল ১৯৪৮, প্রথম বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৪৮, পৃ. ১৫*

৭০. *প্রাগুক্ত।*

৭১. *বেগম রেবেকা আখতার বানু, পাকিস্তানের বাণীচিত্র, ৮ই এপ্রিল ১৯৪৮, প্রথম বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৪৮, পৃ. ১৫*

৭২. *বেগম রেবেকা আখতার বানু, সমাজ ও চলচ্চিত্র শিল্পী, সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০ই আগস্ট, ১৯৪৭, পৃ. ১৫*

৭৩. *বেগম রেবেকা আখতার বানু, সমাজ ও চলচ্চিত্র শিল্পী, সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০ই আগস্ট, ১৯৪৭, পৃ. ১৫*

৭৪. *মাহমুদা খাতুন, সাম্প্রতিক কাব্যধারার ভূমিকা, সাপ্তাহিক বেগম, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। পৃ. ৪*

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. *অধ্যাপিকা আফিয়া খাতুন, পূর্ব বাংলার সাহিত্যের গতি কোন্ পথে? সাপ্তাহিক বেগম ৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১১ই মার্চ, ১৯৫৬, পৃ. ৪*

৭৬. *অধ্যাপিকা আফিয়া খাতুন, প্রাগুক্ত।*

৭৭. *দিলারা সিদ্দিকা, একুশে ফেব্রুয়ারি, সাপ্তাহিক বেগম, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪৭শ সংখ্যা, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪, পৃ. ৪*

৭৮. *মোহসেনা ইসলাম, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০ই আগস্ট, ১৯৪৭, পৃ. ৯*

৭৯. *মোসফেকা রহমান, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, সাপ্তাহিক বেগম, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২*

৮০. *মিসেস ইব্রাহীম এম.এ.,বি.টি. বাংলা ভাষায় আমাদের সমস্যা, সাপ্তাহিক বেগম, ৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১২ই এপ্রিল, ১৯৫৬, পৃ. ১১*

৮১. *অধ্যাপিকা হামিদা রহমান, জীবনের বিভিন্ন স্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার, সাপ্তাহিক বেগম, ১৮শ বর্ষ ১১ শ সংখ্যা, ৭ই মার্চ, ১৯৬৫, পৃ. ৬*

৮২. *অধ্যাপিকা হামিদা রহমান, প্রাগুক্ত*

৮৩. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

'বেগম' পত্রিকায় প্রতিফলিত বাঙালি মুসলিম-নারীর ভাষাচিন্তা

মনের ভাব প্রকাশের জন্যে বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দসমষ্টি যা স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ কোনও জনসমাজে ব্যবহৃত হয়– তাই ভাষা।[১] সুদূর অতীতে মানবসমাজে কবে কখন কীভাবে ভাষার আবির্ভাব, কীভাবে মানুষ প্রথম কথা বললো, সে কি প্রকৃতির ধ্বনি অনুকরণ করতে গিয়েই নাকি, দৈবাৎ দেহের অভ্যন্তরভাগ থেকে এর উৎসারণ তা আজো রহস্যাবৃত। ধ্বনির মাধ্যমে ভাব বিনিময় পশু জগতেও চলে, তবে সে ধ্বনি খুবই সীমিত, বিশেষ কতকগুলি ভাব প্রকাশেই তা নিঃশেষিত; কিন্তু মানুষের উচ্চারিত ধ্বনির সেই সীমাবদ্ধতা নেই। সে অজানা ধ্বনি প্রতীক সৃষ্টি করে অজানা ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে।[২]

মানুষের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের প্রধানতম বাহন হচ্ছে ভাষা। এই ভাষার ব্যবহার দুটো রূপে হয়ে থাকে– মৌখিক এবং লিখিত। তবে মুখের ভাষা এবং লিখিত ভাষায় পার্থক্য থাকে। মানুষ কথা বলার সময় অনেক অসম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করে– তবে এতে তার ভাবের প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকে না কারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে সে অর্থ প্রকাশ সম্পূর্ণ করে। কিন্তু লিখিত রূপে এই সুযোগ থাকে না বলে পুরো বক্তব্যই স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে হয়। অসম্পূর্ণ লেখা কোনও অর্থই প্রকাশ করে না। কথা বলার সময় প্রচুর আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে; স্থানে অস্থানে বিদেশী– বিশেষ করে ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ভাষার শুদ্ধ লিখিত রূপে আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ এবং নিরুপায় না হলে বিদেশী শব্দের প্রয়োগ পরিত্যাজ্য। লিখিত ভাষায় বানান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যতি চিহ্নের প্রতিও এক্ষেত্রে মনোযোগী হতে হয়। সংবাদপত্র/সাময়িকপত্রে লেখার সময়ে ভাষা ব্যবহারে অনেক বেশি যত্নবান হতে হয়, সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য হল পাঠকের কাছে খবর ও মন্তব্য পৌঁছে দেওয়া। এই পাঠক যেমন দশ বছরের বালক হতে পারে তেমনি ৭০ বছর বয়সের বৃদ্ধও হতে পারে, একজন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন দিনমজুর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষই সংবাদপত্রের পাঠক হতে পারে। তাই প্রত্যেক পাঠকের পড়ার এবং বুঝার উপযোগী করে একে উপস্থাপন করতে হয়। তাই এর ভাষা হতে হয় শুদ্ধ, স্পষ্ট, সহজ, সাবলীল, প্রত্যক্ষ এবং বাহুল্য বর্জিত। সংবাদপত্রের ভাষা তার পাঠকের ভাষাকে প্রভাবিত করে। তাই সংবাদপত্রের ভাষারীতি ও বানান সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক হতে হয়।[৩]

মুসলিম মহিলা সম্পাদিত বাঙালি মুসলিম নারীর জন্য প্রকাশিত উপমহাদেশের প্রথম সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেগম' (১৯৪৭) বাংলা ভাষায় রচিত। বাংলা ভাষা– যে ভাষা বাঙালি জনসমাজে প্রচলিত, যে ভাষা বাঙালি মাত্রই জানে, বলে, শোনে এবং বোঝে, যে ভাষায় বাঙালি বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে তার যাবতীয় সুখ-দুঃখ, ভাবনা-চিন্তা প্রকাশ করে আসছে তাই বাংলা ভাষা।[৪] খুব স্বাভাবিক যে, বাঙালি নারীকে বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম নারীকে উদ্দেশ্য করে প্রকাশিত এই

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকাটি ভাষা-মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে বাংলা ভাষাকে। তৎকালীন মুসলমান সমাজের অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে নারীকে মুক্ত করার মানসে এই পত্রিকার আবির্ভাব। তাই ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পত্রিকাটি অত্যন্ত সচেতনভাবে সহজ, সাবলীল এবং স্পষ্ট থাকার চেষ্টা করেছে। মূলত '৪৭ এবং তার পরবর্তীকালেও বেশ কিছু সময়ে বাঙালি নারীসর্বতোভাবে শিক্ষার আস্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি। নাগরিক জীবনের কোনও কোনও নারী এই সুযোগ পেলেও এবং বেশ কিছুদুর এগিয়ে গেলেও পল্লীএলাকার নারীরা এক্ষেত্রে ছিল একেবারেই পিছিয়ে। আর 'বেগম'-এর 'টার্গেট পিপল'ও ছিল এইসব পিছিয়ে পড়া নারী। তাই বক্তব্য ও মন্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে 'বেগম'-এইসব পিছিয়ে পড়া নারীদের বিষয় বিবেচনায় রেখে সহজবোধ্য এবং সহজপাঠ্য করে ভাষা ব্যবহার করেছে।

'বেগম' পত্রিকার ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার মত। যেমন, প্রথমত শব্দের বানান। বস্তুত, বাংলা ভাষায় বানান সমস্যা চিরকালীন। বানান সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম থাকা সত্ত্বেও এ-সংক্রান্ত তর্ক-বিতর্ক, দ্বন্দ্ব ঘটেই চলেছে। বর্তমানে ভাষা সংক্রান্ত আলোচনার প্রধানতম শংকা এবং নীতির দিক বলা হয় বানান বিভ্রাটকে। এই বিভ্রাট সংবাদপত্রের পাতাতেও অহরহ ঘটে চলেছে। যদিও সাংবাদিকতার পরিভাষায় 'হাউস স্টাইল' নামক একটা ধারণার প্রচলন আছে– যার অর্থ প্রচলিত বিধি যাই হোক না পত্রিকা অফিসগুলো কোনও কোনও বানান ৰা শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে একেবারেই নিজস্ব একটা স্টাইল চালু করে {যেমন– সাপ্তাহিক 'যায় যায় দিন' কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ-র স্থলে '<' নিয়মিত ব্যবহার করছে। যেমন– পৃন্টমিডিয়া (প্রিন্ট মিডিয়া), কৃকেট (ক্রিকেট) }। সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকাতেও বানান সংক্রান্ত এ-ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন– দূর্ব্বল (প্রকৃত বানান দূর্বল, ২৯ ফেব্রয়ারি, ১৯৪৮), সর্ব্বদা (প্রকৃত বানান সর্বদা– ২৯ ফেব্রয়ারি,১৯৪৮), অর্জ্জন (প্রকৃত বানান অর্জন, ২৯ ফেব্রুয়ারি), মার্চ্চ (প্রকৃত বানান মার্চ, ৭ মার্চ, ১৯৪৮)[৫], পূর্ব্ব (প্রকৃত বানান পূর্ব, ৭ মার্চ, ১৯৪৮), সূর্য্য (প্রকৃত বানান সূর্য, ৭ মার্চ, ১৯৪৮), কার্য্য (৭ মার্চ, ১৯৪৮), সর্ব্বনাশ (৭ মার্চ, ১৯৪৮), বার্সী, অর্জ্জন, চর্চ্চা, সর্ব্বসাধারনের, কারুকার্য্য, (১৪ মার্চ, ১৯৪৮), কর্ত্তব্য, কর্ম্মচারী, নির্য্যাতিত, মর্য্যাদা (২৮ মার্চ, ১৯৪৮), নির্দ্দেশ, ধর্ম্মপ্রান, কর্ম্মজীবন, (৪ এপ্রিল, ১৯৪৮), ধর্ম্মযাজক (১১ এপ্রিল, ১৯৪৮), নির্ব্বাহ, অপূর্ব্ব, উপার্জ্জন, অপরিহার্য, জীবিকার্জ্জন, কর্ম্মসংস্থান, পর্দ্দা, সর্ব্বজন বিদিত, সর্ব্বোতভাবে, আর্ন্তজ্জাতিক (২রা মে, ১৯৪৮), ভূতপূর্ব্ব, উদ্ধারাকার্য্যে (২৩ মে, ১৯৪৮), পরিবর্ত্তন (৫ জুন, ১৯৪৮), পরবর্ত্তী, নির্ব্বিশেষে (২৭ জুন, ১৯৪৮), সর্ব্ববাদীসম্মত, পরিবর্ত্তিত, সর্ব্বজনবিদিত (১১ জুলাই, ১৯৪৮), সৌন্দর্য-চর্চ্চা (১৮ জুলাই, ১৯৪৮), পর্য্যালোচনা (২২ জানুয়ারি, ১৯৫০), নির্ব্বাচিত (২৯ জানুয়ারি, ১৯৫০), ধর্ম্ম (৮ জুন, ১৯৫২), রুপচর্চ্চা (২৩ নভেম্বর, ১৯৫২)। শব্দের বানানের এই রীতি ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত 'বেগম' অনুসরণ করেছে। ১৯৫৬ সাল থেকে এইসব শব্দের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিই অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাকরণগত রীতি অনুযায়ী এই বানানগুলো ভুল। কারণ নিয়ম অনুযায়ী রেফ (র্) -এর পর ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব হয় না।

সংবাদপত্রের ভাষা সচল, সদাপ্রবহমান এবং এর লেখকগোষ্ঠী– যাদের সাংবাদিক বলা হয়, তাঁরা প্রতিনিয়ত একটা চাপের মধ্যে, বিশেষ করে সময়ের চাপের মধ্যে থেকে কাজ করেন। তাই সংবাদপত্রের ভাষা খুবই পরিমার্জিত হতেই হবে এমন না হলেও তা অবশ্যই সুন্দর ও সাবলীল হতে হয়। আর এ-জন্যই দ্রুত লিখিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত লেখাকে ব্যস্ততার সাহিত্য বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে সাংবাদিকের নিজস্ব ভঙ্গির স্থান দেওয়া হয়। কড়াকড়িভাবে ব্যাকরণের রীতি-নীতি মেনে চলা না হলেও ব্যাকারণের ন্যুনতম শৃঙ্খলা মেনে চলা দরকার যেন প্রচলিত ধারণা বা উপলব্ধি বিপর্যিত না হয়, গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খবরটি পড়তে না হয়, পড়ামাত্রই বোঝা যায়। ভাষার দুটি রীতি– সাধু ও চলিত। দুটো রীতি অনুসারেই সংবাদপত্র পরিচালিত হতে পারে। তবে অধিকাংশ সংবাদপত্র চলিত ভাষারীতি অনুসরণ করে। 'বেগম' পত্রিকাও চলিত ভাষার অনুসারী। কিন্তু চলিত রীতি অনুসরণ পুরোমাত্রায় করেনি। সম্পাদকীয় সর্বদা চলিত রীতিতে লেখা হলেও কোনও কোনও প্রবন্ধ লেখা হয়েছে সাধু রীতিতে। যেমন– 'পূর্ব্ব-পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' (৩ জুন, ১৯৫১), 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান' (৬ মার্চ,১৯৫৫), 'নারী স্বাধীনতার শর্ত' (২২ নভেম্বর, ১৯৫৩)। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একই রচনাতে সাধু-চলতির মিশ্রণ লক্ষ করা গেছে। যেমন– 'জনাব সুলেরীর এই অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে কাহারো মনে কোনরূপ দ্বিমত থাকতে পারে না' (১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬)। এখানে 'কাহারো' শব্দটি সাধুরূপ। 'পুরুষের সহিত বয়কট করে চললেই আল্লাহ তা'লা সন্তুষ্টি হবেন', 'খোদা তাহাদের শরীরের গঠন তৈরি করেছেন কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায়' (২২ জুলাই, ১৯৫১), 'কিন্তু কারো তা সম্ভব হয় নাই' (১ জানুয়ারি, ১৯৫৬),' অগ্রগতির জন্য আকুল আকাংখা তাদের মধ্যেই জাগ্রত হয়েছে' (১৩ নভেম্বর, ১৯৪৯)। 'বেগম'-এ ভাববাচ্যে ভাষা লেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন– 'দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয় ভূমিকার কথা সর্বত্রই স্বীকৃতি লাভ করবে' (১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬); 'সুদীর্ঘ দশ বছরের মধ্যেও তার কোনরূপ পরিবর্তন সম্ভব হল না' (৭ জুলাই, ১৯৫৭)। কোথাও কোথাও কর্তৃবাচ্য এবং ভাববাচ্যের মিশ্রণ ঘটেছে। যেমন– 'সুতরাং ইহার যৌক্তিকতা অনুসন্ধানের প্রয়োজন করে না' (১৮ জানুয়ারি, ১৯৫৯)– এখানে প্রয়োজন করে না–র জায়গায় প্রয়োজন নেই– লিখলেই চলত।

ভাষার ব্যবহারে কোনও কোনও স্থানে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন– 'সেখানে বর্তমান যুগোপযোগী নারীজাতির মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে' (২২ নভেম্বর, ১৯৫৩)। প্রকৃতপক্ষে 'যুগোপযোগী' শব্দটি বর্তমান যুগকেই নির্দেশ করে। তাই 'বর্তমান যুগোপযোগী' শব্দটি শ্রুতিমধুর নয়। আর একস্থানে উল্লেখিত– 'উভয়রাষ্ট্রের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু ও মুসলমানগণ উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ এই বিরাট দানে উপকৃত হয়েছে' (১৮ জানুয়ারি, ১৯৫৯)– বাক্যটিতে 'গণ' শব্দ দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। যদি বাক্যটি এভাবে লেখা হত– 'উভয় রাষ্ট্রের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ এই বিরাট দানে উপকৃত হয়েছে'– তবে তা সাবলীল হত। 'গ্রাম্য বাঙালী মেয়েদের কুসংস্কার' শীর্ষক প্রবন্ধে 'সব চুড়িগুলো' (২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮)– লেখা হয়েছে। এখানে একই সঙ্গে বহুবচন নির্দেশক দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে 'সবচুড়ি' নতুবা 'চুড়িগুলো' লিখতে হবে। আরো কিছু বাক্য যেমন– 'মুষ্টিমেয় সংখ্যক হয়েও তারা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পেরেছিল' (২২ জুলাই, ১৯৫১)–এখানে বাক্যটি 'সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হয়েও তারা সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য করতে পেরেছিল'– লিখলে সহজপাঠ্য হয়।

বাংলাভাষায় বাক্যের প্রথমে কর্তৃপদ এবং সবশেষে ক্রিয়াপদ স্থাপিত হয়। বাংলা ভাষায় বাক্যগঠনের এই নিয়মটিই প্রচলিত। কিন্তু 'বেগম' পত্রিকায় বাক্যের গঠনশৈলী অন্যভাবেও করা হয়েছে। যেমন– 'ভারতের দীর্ঘদিনের শক্তিসঞ্চয়ে একদিন তারাও হল স্বাধীন' (২২ জুলাই,

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫১)। 'বাংলার নারী ও বর্তমান পৃথিবী' শীর্ষক আলোচনায় বাক্যটি এভাবেও লেখা যেত– 'ভারতও দীর্ঘদিন ধরে শক্তি সঞ্চয় করে একদিন স্বাধীন হল'। একই আলোচনায় আর একটি বাক্য ছিল এরকম– 'আজকের নারীর দায়িত্ব কাজ অনেক বেড়ে গেছে'। এখানে একই অর্থ বহনকারী দুটো শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে–'দায়িত্ব', 'কাজ'। বাক্যটি– 'আজকে নারীর দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে'– এভাবে লিখলেই যথেষ্ট। একইভাবে ৮ম বর্ষ ৪২ সংখ্যা-র সম্পাদকীয়তে– 'জাতির কপালে শুধু অমংগলই ডেকে আনবে' লেখাই যথেষ্ট। অনুরূপভাবে 'কেবলমাত্র' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০, সম্পাদকীয়)– যেখানে শুধু 'কেবল'– এর ব্যবহারই হবে শুদ্ধ। ১১শ বর্ষ ২২শ সংখ্যার 'ঢাকা রেল স্টেশনের সংস্কার' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা– 'এই সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন'– বাক্যে 'স্বয়ং' শব্দটি ব্যবহার না করলেই শ্রুতিমধুর হত। এবং 'অন্যান্যদের' পরিবর্তে 'অন্যদের' শব্দটি যথার্থ ছিল। কোথাও কোথাও শব্দের ভুল প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। যেমন– 'তাই আজ আরও জানবার ও পাবার আহূতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে পাকিস্তানের অগণিত জ্ঞানান্বেষী, আত্মপ্রতিষ্ঠায় উন্মুখ নারী (১৪ আগস্ট, ১৯৬০)–বাক্যে 'আহূতি' শব্দটি ভুল। এর প্রকৃত অর্থ 'মহৎ কাজে আত্মত্যাগ'। এখানে 'আকুতি' শব্দটি যথাযথ হবে। 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের দান' শীর্ষক প্রবন্ধে কবি সাহিত্যিকদের নামের পরে 'প্রভৃতি' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন– যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেন, কবি কায়কোবাদ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী, সেরাজ উদ্দীন, পণ্ডিত রেয়াজ উদ্দীন সানভাদী, মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য (১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬)। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির নামের পরে প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় না। এক্ষেত্রে প্রমুখ ব্যবহার করা উচিত। তেমনি– টি, টা, খানা, খানি প্রভৃতি বস্তুবাচক শব্দ ব্যক্তির আগে বা সঙ্গে ব্যবহার হয় না যেমনটি হয়েছে ৪র্থ বর্ষ ২৭শ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে। এখানে 'মেয়েদের অর্থনৈতিক জীবন' শীর্ষক সম্পাদকীয়ের একস্থানে –'মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যে কত দুর্বহ হয়ে উঠেছে তা প্রত্যেকটি ব্যক্তিই হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে পারেন'– বাক্যে 'প্রত্যেকটি ব্যক্তি' না লিখে 'প্রত্যেক ব্যক্তি' অথবা 'ব্যক্তিমাত্রই' লেখাই শ্রেয় ছিল।

নারীদের জন্য এবং নারীদের দ্বারা লিখিত পত্রিকা সাপ্তাহিক 'বেগম'-এর ভাষাচিন্তার প্রধান যে প্রবণতাটি লক্ষণীয় তা হল নারীবাচক শব্দের ব্যবহার। 'বেগম' সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে শব্দের লিঙ্গান্ত র করার চেষ্টা করেছে এবং এই প্রবণতা গবেষণার আওতাভুক্ত প্রতিটি সংখ্যা (১৯৪৭-১৯৭০) – তেই লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ পত্রিকায় ব্যবহৃত নারীবাচক শব্দসমূহের খুব সংক্ষিপ্ত একটি তালিকা উপস্থাপন করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। যেমন– দুঃসাহসিকা, অধিকারিণী, নির্য্যাতিতা, অসুস্থা, শিক্ষিতা, (২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮); প্রচারকারিণী, (৭ মার্চ, ১৯৪৮), পরিচিতা, সভ্যা, খ্যাতনাম্নী (১৪ মার্চ, ১৯৪৮); প্রগতিশীলা, জর্জরিতা, স্বদেশপ্রেমিকা, বন্দিনী, সম্পাদিকা, প্রার্থিনী, সাংবাদিকা, অন্যতমা (২৮ মার্চ, ১৯৪৮); গন্যা (১৮ আগস্ট, ১৯৪৯); উত্তীর্ণা, ডিপ্লোমাপ্রাপ্তা, শিরস্ত্রাণধারিণী (৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯); সদস্যা (১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯); পরিচর্য্যাকারিনী (২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯); বিশিষ্টা, সদস্যা (২৭ নভেম্বর, ১৯৪৯); শ্রমিকা, পরিচালিকা, সভ্যা, সাহিত্যিকা, নেত্রীস্থানীয়া (২৫ এপ্রিল, ১৯৪৮); প্রতিভাদীপান্বিতা, অবতীর্ণা, অনভিষিক্তা, সহানুভূতিশীলা, ঈর্ষান্বিতা, আলোকপ্রাপ্তা, অবহেলিতা (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮);

Dhaka University Institutional Repository

পারদর্শিনী, রক্ষণশীলা, শিক্ষার্থিনী, পাঠিকা, অধ্যাপিকা (২৭ জুন, ১৯৪৮); ভিক্ষুর্নী, বিনীতা, দুর্ব্বলা, বিমানচালিকা (৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৯); অগ্রদূতী, সমাজসেবিকা, বিশেষ্যা, অপরিচিতা, গ্রাহীতা (২৭ জুলাই, ১৯৫২); অসহায়া, নিঃসহায়া, আশ্রয়হীনা, কাজেরতা, পরিহিতা, সঙ্কুচিতা (৩ মে, ১৯৫৩); যত্নবতী, অংকনরতা, নেতৃস্থানীয়া, আবাদা, আধুনিকা (৩১ মে, ১৯৫৩); সহযোগিনী, দীক্ষিতা, উত্তরাধিকারিণী, অভিশপ্তা (৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪), রোগিনী, সম্মানিতা, প্রবীনা, নবীনা, প্রধানা, প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা (১১ নভেম্বর, ১৯৫৬); হার্পবাদিকা, বয়স্কা, বুদ্ধিদীপ্তা, উপবিষ্টা, মেধাবিনী, উত্তীর্ণা, নিবেদিতা প্রাণ (১ লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০); সভানেত্রীত্ব, কর্মকর্ত্রী (৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০); মরহুমা, রোরোদ্যমানা, পাড়াপ্রতিবেশিনী, স্বাবলম্বিনী, পিতৃগতপ্রাণা (১৭ ডিসেম্বর, ১৯৬৭)– এরূপ অসংখ্য শব্দের নারীরূপ দেওয়া হয়েছে। সকল ক্ষেত্রেই যে সঠিক লিঙ্গান্তর হয়েছে তাও নয়। যেমন– 'সাংবাদিক' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ মহিলা সাংবাদিক, সাংবাদিকা নয় ; তেমনি 'ভিক্ষুক'– এর স্ত্রীলিঙ্গ 'ভিখারিণী', ভিক্ষুণী নয়।

সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকাটির আর্বিভাব এবং পথচলা– পুরোটাই ছিল বাঙালি মুসলিম নারীর উৎকর্ষ সাধনকে ত্বরান্বিত করার মানসে। অশিক্ষা, অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোর জগতে নারীকে নিয়ে আসা, গৃহকোণের অন্ধকার কুঠুরী থেকে বাইরের কর্ম পরিবেশের আভাষ দেওয়া– এই লক্ষ্যে পরিচালিত 'বেগম'-এর সার্বিক প্রচেষ্টা ছিল তার পাঠককে বিষয়ের বা কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করানো। অর্থাৎ যে মূল বিষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ বা সম্পাদকীয়ের অবতারণা– সেই মূল বিষয়টি সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করাই ছিল 'বেগম'-এর মূল লক্ষ্য– যেন পাঠক তার প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, আর এ-লক্ষ্য পূরণ হলেই 'বেগম'– এর যাবতীয় পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করা হত এ-বিষয়টি মাথায় রেখে 'বেগম' সবসময় মূল বিষয়ের উপস্থাপন– অর্থাৎ কীভাবে, কত রকমভাবে বললে পাঠক সহজে বুঝবে– তা নিয়েই সচেষ্ট থেকেছে, ভাষার আঙ্গিকগত দিক হয়তো লক্ষ করেনি। সেক্ষেত্রে আমরা দেখি– সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্রের প্রাথমিক কিন্তু প্রধানতম যে লক্ষ্য, অর্থাৎ পাঠকের নিকট সহজ, সাবলীল, প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন– 'বেগম' তা সফলভাবেই সম্পাদন করতে পেরেছে। খুব অল্পকিছু ক্ষেত্রে ব্যাকরণজনিত কিছু ভুল লক্ষ করা গেলেও সাংবাদিকতার সামাজিক দায়বদ্ধতার বিচারে সে-ভুল নেহাৎ সামান্যই বলা চলে।

তথ্যসংকেত

১. *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, আনন্দবাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা, জুন, ১৯৯৬, পৃ. ১৬*
২. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫*
৩. *আবদুল্লাহ আল মুতী ও আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), সংবাদপত্রে বাংলাভাষা, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৮৯*
৪. *বাংলাভাষায় ব্যাকরণ, প্রাগুক্ত।*
৫. *১৯৪৭-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত মার্চ মাসের প্রতিটি সংখ্যায় এই বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে '৬৫-পরবর্তী সংখ্যায় মার্চ্চ '-এর পরিবর্তে 'মার্চ' লেখা হয়েছে*
৭. *হায়াৎ মামুদ, বাংলা লেখার নিয়ম-কানুন, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩৭*
৮. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫*
৯. *প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭*

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

যে নারীজাগরণের সূচনা পাশ্চাত্যে দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে তার প্রায় শতাব্দীকাল পরে অর্থাৎ মোটামুটিভাবে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলায় নারীজাগরণের সূত্রপাত হয় এবং এর অনেকটাই সম্ভব হয়েছিল স্বদেশী ও 'সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন' দ্বারা নারীসমাজ উদ্বুদ্ধ হবার ফলে। উনিশ শতকের বাংলার দিকে তাকালে দেখা যাবে ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকে হিন্দু-মুসলিম নাগরিকের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে এক বিরাট ব্যবধান ছিল। ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতিকে হিন্দুসমাজ দ্রুত গ্রহণ করেছিল বলে এবং মুসলিম সমাজ তা থেকে বিরত থাকায় বাস্তবে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে তৎকালীন হিন্দু-মুসলিম উভয়েরই ধারণা জন্মে গেল যে, এই জাগরণ বা পরিবর্তন মোটামুটি হিন্দুসমাজের ব্যাপার। প্রায় ৫০ বছর পর মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা গ্রহণের মধ্য দিয়ে আধুনিক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়।[১] মুসলিম সমাজ এক পর্যায়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জীবনবোধের প্রতি আকৃষ্ট হলেও মুসলিম নারীসমাজের জাগরণের প্রশ্নেও মুসলিম নারীর শিক্ষা ও মুক্তির প্রশ্নটি খুব বেশি সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করতে পারেনি। তবে আবদুল লতীফ, স্যার সৈয়দ আহমদ প্রমুখ মনীষীর প্রচেষ্টায় এক সময় সমাজে নারীশিক্ষার জন্য আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে ওঠে এবং উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পরবর্তী দুই শতকের মধ্যে বিবি তাহেরন নেছা (জন্ম-মৃত্যু অজ্ঞাত), নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরারাণী (১৮৪৭-১৯০৩) এবং করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯২৬) এই তিনজন নারীর আবির্ভাব ঘটে যাঁরা মুসলিম নারীকে অবরোধ থেকে বের করার জন্য প্রথম আহ্বান জানিয়েছিলেন।[২] তাঁদেরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে যে মহিয়সী নারীর আহ্বানে এবং আন্তরিকতায় বাঙালি মুসলিম নারী সবচেয়ে বেশি মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল এবং আস্বাদ গ্রহণ করেছিল, তাঁর নাম বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। সমাজে এরূপ প্রগতিশীল ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের ফলে এবং সরকারের কিছুটা নমনীয় মনোভাবের কল্যাণে এক সময় বাঙালি মুসলিম নারীসমাজ মুক্তির দোরগোড়ায় এগিয়ে যায়। কিন্তু '৪৭ এর ভাগাভাগির রাজনীতি[৩] ও পাকিস্তানের দাবি বাঙালি মুসলিম-নারীর এই পুনর্জাগরণে কালোছায়া বিস্তার করে। ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের ফলে পূর্ববাংলা নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অংশভূত হয় এবং নতুন রাষ্ট্রের ধর্মনির্ভরতা বাঙালি মুসলিম নারীর জন্য এক সঙ্কটজনক অবস্থা সৃষ্টি করে। কেননা ধর্ম প্রায়শই কিছু লোকের ক্রীড়নক হয়ে নারীর অগ্রগতিকে ব্যাহত করে থাকে। ফলে ১৯৪৭ সালের পর আবার কিছু সময়ের জন্য নারীরা কঠোর অবরোধ, নিরক্ষরতা এবং কুসংস্কারের বেড়াজালে বন্দী হলো। হিন্দুদের দেশ ত্যাগের ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়।[৪] ছাত্রী ও শিক্ষার অভাবে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীকে গৃহবন্দী করার জন্য মুসলিম লীগ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল অপচেষ্টা শুরু হয় আর এই পরিস্থিতিতেই আবির্ভাব ঘটে বাঙালি মুসলিম নারীর প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেগম'-এর।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি মুসলিম নারীকে নব জন্মলব্ধ রাষ্ট্রের সম্মান ও গৌরব অক্ষুণ্ন রাখতে পুরুষের পাশাপাশি সমান তালে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে এবং মূলত সাহিত্যিক ও লেখিকা সৃষ্টির প্রবল আকাঙ্ক্ষায় 'বেগম'-এর প্রতিষ্ঠা।*

এই দাবি মেটাবার সম্পূরক শর্ত হিসেবে 'বেগম' অনুভব করেছে সমাজে শিক্ষিত নারীর প্রয়োজনীয়তা। সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ব বাংলার নারীসমাজকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'বেগম' দেখেছে শিক্ষার কী প্রয়োজন তা এই নারীসমাজ জানে না, এমনকি জাতির ভবিষ্যৎ তার সন্তানটিকে কী করে মানুষ করতে হবে তাও সে জানে না। এ-দেশের নারীসমাজের চারদিকে শুধু অন্ধকার আর কুসংস্কারের বেড়াজাল।[৫] শিক্ষার উপর জোর আরোপ করে 'বেগম' তার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ করেছে আলোকদূতী বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ছবি দিয়ে। তবে 'বেগম'-এর প্রথম পর্যায়ের বেশ কিছু সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধে এরূপ মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে যে, লেখাপড়া নারীজাতির উপকারে আসবে এবং একইভাবে সমাজ উপকৃত হবে, কারণ শিক্ষার মধ্য দিয়ে ভাল জননী ও সঙ্গিনী তৈরি করা সহজ এবং এর মধ্য দিয়ে সনাতন আদর্শও বজায় থাকবে। একারণে কলেজীয় শিক্ষারীতির পরিবর্তন সাধনের কথাও বলা হয়েছে। বলা হয়–

> *আমাদের দেশে মেয়েদের জন্য এখন পর্যন্ত পৃথক শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়নি। পুরুষদের জন্য যে পাঠ্যতালিকা নির্দিষ্ট রয়েছে, মেয়েদেরকেও তারই অনুসরণ করতে হচ্ছে। প্রবেশিকা পরীক্ষা বা তার পূর্বেই বহু মেয়ের বিবাহিত জীবন শুরু হয় এবং সে সংসারে প্রবেশ করে। এইজন্য তাদের পাঠ্যতালিকার মধ্যে এমন কতকগুলো বিষয় সন্নিবেশিত করা দরকার যা ঘর সংসারের কাজে তাদেরকে সাহায্য করতে পারে। ভবিষ্যতে মেয়েদের আদর্শ গৃহিনী করে তোলাই হবে নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য।*[৬]

মূলত গৃহের সুখই নারীর মূল ভাবনা হওয়া উচিত– 'বেগম'-এ এরূপ মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে। নারীশিক্ষার প্রভাবে গার্হস্থ্য জীবনে যেন কোনরূপ সমস্যা দেখা না দেয় বারবার সেই পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সম্ভব হলে পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতিতেই গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষালাভের জন্য প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে। এমনকি নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত শিশুরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে তখনও নারীদের অর্থনৈতিক ভূমিকা পালনের প্রশ্নে যে উপায়ের কথা বলা হয়েছে তাও ছিল পুরোটাই পরিবার-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ পারিবারিকভাবে সেলাই, সূচীশিল্পের কাজ করে, আচার বানিয়ে বা ইত্যাকার কুটির শিল্পের মধ্যদিয়ে পরিবারের আর্থিক অনটনে সাহায্য করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তবে ক্রমশ এই দৃষ্টিভঙ্গি কাটিয়ে উঠে 'বেগম' নারীকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে পুরুষের পাশাপাশি একই শক্তিতে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসার সাম্ভাব্যতায় আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং আহ্বান জানায়। 'বেগম'-এনে করে স্বাধীনতা অর্জন করাই শেষ কথা নয়, স্বাধীনতা লাভের পর সুনিয়ন্ত্রিতভাবে দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধনই সব থেকে বড় কথা। এত কষ্টে অর্জিত পাকিস্তানকে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে ও সমাজব্যবস্থায় সবদিক দিয়েই সুপ্রতিষ্ঠিত করার দিকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে মনোযোগ দিতে হবে।[৭] 'বেগম' মনে করে গৃহধর্ম পালন মুসলিম নারীর পক্ষে অবশ্য পালনীয় হলেও প্রত্যেক

---

* প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা 'বেগম'-এর সম্পাদকীয়

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম নরনারীর সামাজিক দায়িত্বও রয়েছে। সমাজের সঙ্গে তাদের জীবন্ত সম্পর্ক। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম মেয়েদের যে শোচনীয় অবস্থা তাতে তাদের পক্ষে কওমের খেদমত করা সম্ভব নয়। কওমের একনিষ্ঠ সেবিকারূপে প্রত্যেক মুসলিম নারীকে গড়ে তুলতে হলে তাদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে।[৮]

এই অবস্থার পরিবর্তনের প্রধান হাতিয়ার বিবেচনা করা হয়েছে শিক্ষাকে। এবং এই শিক্ষা শুধু গৃহস্থালির উন্নতি সাধনের জন্য নয় বরং যে শিক্ষা নারীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে নিজেকে ভাবতে শিখায়, সমাজে নিজের অধিকার যাচাইয়ে ও প্রয়োগে অনুপ্রাণিত করে সেই শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। এই শিক্ষায় আলোকিত নারী শুধু নিজের জন্যই কাজ করবে না বরং সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অন্যসব নারীকেও আলোকের পথে টেনে আনবে। একটি দরিদ্র রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের পক্ষে রাষ্ট্রপ্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা পাওয়া হয়ে ওঠে না। সেক্ষেত্রে সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীর দায়িত্ব হচ্ছে সুবিধাবঞ্চিতদের সাহায্য করা। 'বেগম' পত্রিকাটিয় বারবার এই মন্তব্যই করা হয়েছে– একজন শিক্ষিত নারী দায়িত্ব নেবে আর দশজন অশিক্ষিত নারীকে শিক্ষিত করে তোলার। শুধু নিজে শিক্ষিত হয়েই গর্ব অনুভব করা নয় বরং সমাজের শতকরা ৯৫ জন মহিলাকে শিক্ষিত করে তুলেই শিক্ষা ও প্রগতির গর্ব করা সমুচিত।[৯] এ-কারণে শিক্ষিত ও ধনী ঘরের মেয়েদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে বিভিন্ন সংঘ বা নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করে পল্লীর নারীদের বিনা বেতনে শিক্ষাদানের জন্য। এখানে অনানুষ্ঠানিকভাবে গৃহস্থালির নিত্যপ্রয়োজনীয় রীতি অনুযায়ী প্রণালীবদ্ধভাবে পড়াশুনা করার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। শুধু নিজে শিক্ষিত হওয়াই নয়, শিক্ষিত হয়ে মুসলিম নারীজাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আদর্শ অনুসরণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এতে। 'বেগম' রোকেয়ার প্রচেষ্টায় মুসলিম নারী আজ শিক্ষার গর্ব করে কিন্তু তারাই আজ রোকেয়ার আদর্শ থেকে বিচ্যুত। দেখা যায় তথাকথিত এই শিক্ষিত নারীরাই সমাজে নারীদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরবিভাগ তৈরি করেছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে, পাড়াগেঁয়ে ইত্যাকার অযৌক্তিক শ্রেণীবিভাগ করে তারা শিক্ষার মূল লক্ষ্যকে অপমানিত করেছে। 'বেগম' পত্রিকাটি এরূপ নারীদের বারবার শিক্ষার প্রকৃত মর্মার্থ উপলব্ধি করে প্রত্যেককে এক একজন রোকেয়া'য় পরিণত হবার আবেদন জানিয়েছেন।

শিক্ষার এহেন পরিণতির জন্য সর্বক্ষেত্রে যে শুধু নারীরা নিজেরাই দায়ী তা নয় বরং তৎকালীন সরকারের আরোপিত ত্রটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকেও 'বেগম' দায়ী করেছে অনেকাংশে। বাস্তবিকই দেখা যায়, তৎকালে পূর্ববঙ্গকে কেন্দ্র করে গ্রহণ করা শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ সবসময়েই যে যথোপযুক্ত ছিল তা নয়। যেমন– ভিকারুন্নেসা গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠা। ধনী ব্যক্তি ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মেয়েদের পাঠোপোযোগী করে গড়ে তোলা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেতন, আনুষাঙ্গিক খরচ সবই সাধারণ শ্রেণীর নাগরিকদের আয়ত্তের বাইরে। নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তানে সর্বাঙ্গীন শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে শুধু প্রয়োজন নয় বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত সেখানে শুধু শ্রেণীবিশেষের জন্য এই ব্যবস্থা যে অবধারিতভাবে সমাজের বৃহত্তর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি উন্নাসিক শ্রেণীরই জন্ম দেবে তা বলাই বাহুল্য।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈষম্যের উদাহরণ তুলে ধরে কঠোর ভাষায় এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে 'বেগম'। শিক্ষাখাতে ব্যয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষা উপকরণের সহজলভ্যতা সবক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববঙ্গের প্রতি এক ধরনের উন্নাসিক অবহেলা প্রদর্শন করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু পূর্ববঙ্গের পাঁচকোটি অধিবাসীর জন্য ছিল মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়। তাছাড়া পর্যাপ্ত বিদ্যালয়ের অভাব, উত্তরোত্তর শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংকট এবং শিক্ষকদের তুলনামূলকভাবে কম বেতন প্রদান, সর্বোপরি একটি যথোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নে গাফিলতি, শিক্ষা সংস্কারে অনীহা ইত্যাদি সবমিলিয়ে যে চিত্র ফুটে ওঠে তা ছিল রীতিমতো হতাশাজনক। শিক্ষার সমস্ত দিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন নাগরিকদের উপলব্ধি প্রকাশের মধ্য দিয়ে 'বেগম' শিক্ষার গুরুত্ব প্রকাশ করেছে। 'বেগম' তার পাঠকদের এই বলে সচেতন করার প্রয়াস পেয়েছে যে–

> *প্রত্যেক স্বাধীন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষাই সকল সময় প্রাথমিক বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। কারণ যে দেশের জনসাধারণ শিক্ষিত ও সচেতন নয় সেখানে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের কোন বিকাশই সম্ভবপর হয় না। শিক্ষাকে অবহেলা করে জনসাধারণের জীবনের মানকে উন্নত করার প্রচেষ্টা সর্বত্রই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার সম্প্রসারণের অবহেলাতেই রয়েছে জনসাধারণকে অচেতন ও আচ্ছন্ন করে রাখার অভিসন্ধি। গণতন্ত্র কখনই সফলকাম হতে পারে না যদি না জনসাধারণ তাঁদের মতামত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ দ্বারা একে সঞ্জীবিত করে। কিন্তু গণতন্ত্রের বিকাশমুখী কার্যাবলীতে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত সাধারণ মানুষরা বস্তুত কোনই সাহায্য দিতে পারে না। ইহাতে গণতন্ত্রের নামেই জনতার সচেতন অংশগ্রহণকে এড়িয়ে যাওয়া হয়।*[১০]

শিক্ষিত নারীর স্বাধীন জীবিকার প্রশ্নে কিংবা নারীর কর্মক্ষেত্র নির্ধারণের প্রশ্নেও 'বেগম' প্রথম পর্যায়ে দ্বিধাবিভক্ত থেকেছে। তবে এই দ্বিধাবিভক্তি ছিল খুব অল্প সময়ের জন্য এবং অব্যবহিতকাল পরে এই ইস্যুতে উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে 'বেগম' তার প্রকৃত ও সত্য ভূমিকা উদ্‌ঘাটনে পিছপা হয়নি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে 'বেগম' প্রকাশনার প্রাথমিক বছরগুলোতে নারীকে গৃহের সুখের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতো সেই একই দৃষ্টিকোণ থেকে কর্মক্ষেত্রের প্রশ্নে পরিবার বা গৃহকে বড় করে দেখেছে। তবে অবরোধবাসিনী হিসেবে নয়– সংসারের সক্রিয় অংশীদার হিসেবে। 'পুরুষের দাসীবৃত্তি করার জন্য নয়, স্বামীকে জীবনযুদ্ধে উপযুক্ত সহধর্মিনী হিসাবে সহায়তা দানের জন্য'[১১] – নারীকে উপযুক্ত হতে হবে বলে 'বেগম' মনে করতো।

নার্সিং পেশাকে মেয়েদের জন্য যথোপযুক্ত বলে বর্ণনা করেছে 'বেগম'। মেয়েদের মমতাময়ী, সেবাধর্মী প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই এহেন মনোভাব পোষণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সাংবাদিকতা বৃত্তি, সেনাবাহিনীতে যোগদান ইত্যাকার পেশার কথাও বলা হলেও স্পষ্ট পক্ষপাত লক্ষ্য করা গেছে নার্সিং বৃত্তির প্রতি। নারী মায়ের জাত, আর সেবা নারীর ধর্ম। কাজেই নার্সিংই একমাত্র পেশা যার মধ্য দিয়ে নারী সেবা এবং জীবিকার্জন দুটোই সম্পাদন করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি একাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির অপরিহার্যতা নেই বলে বাংলার মুসলিম নারীদের জন্য এই বৃত্তি

Dhaka University Institutional Repository

অনেক সহজলভ্য। তাই নার্সিং বৃত্তির প্রতি নারীদের আগ্রহী করে তোলা এবং এ-পেশার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের আহ্বান জানায় 'বেগম'। নার্সিং পেশার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত করার জন্যও সমাজকে সচেতন করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় এতে।

সমাজকে সচেতন করার মানসে 'বেগম' সম্পাদকীয় এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধতে সমাজের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ই তুলে এনেছে। যেমন– চলচ্চিত্রশিল্পে বাঙালি মুসলিম নারীর অভিনয় প্রসঙ্গ। ইসলাম ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানে চলচ্চিত্রশিল্প থাকা উচিত কি উচিত নয়– এ প্রশ্নে 'বেগম'-এনে করেছে মানুষের আসল ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তা লাভ করা সহজ হবে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। গণশিক্ষা ও তার প্রসারতার সবচেয়ে বড় পরিবাহক হলো চলচ্চিত্র।[১২] কিন্তু এই চলচ্চিত্রের বিষয় হতে হবে শিক্ষামূলক, নির্দোষ বিনোদন দানই হবে এর লক্ষ্য। চলচ্চিত্রশিল্পে মুসলিম নারীদের অন্ত র্ভূক্ত হওয়াকে 'বেগম' স্বাগত জানিয়েছে। অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ন অবনমিত মানুষের মনের নতুন আলোর ঝলকানি নিয়ে আসেন শিল্পীরা-অভিনেত্রীরা। এই শিল্পীদেরই অন্যতম সম্প্রদায়, তাঁরাই সৃষ্টি করেন যুগের প্রগতিকে। কিন্তু অভিনেত্রী প্রতি সমাজ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। সামাজিকভাবে তাঁরা একধরনের বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করেন। এই সমাজেরই মেয়ে অভিনেত্রী হলে তাকে সমাজ-সংসার থেকে বেরিয়ে যেতে হয়, অভিনেত্রীদের স্বতন্ত্র সমাজের অন্তর্ভূক্ত হতে হয়। অথচ এই সমস্যা অভিনেতাদের মোকাবিলা করতে হয় না। সামাজিক এই অপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছে 'বেগম' ।

'বেগম' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিটি রচনার মধ্য দিয়েই নবগঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি কীভাবে সাধন করা যায় সে-বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। নারীজাতিকে সচেতন করার পাশাপাশি সমাজের সার্বিক বিশেষত অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। এ-লক্ষ্যেই 'বেগম' পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রের উদাহরণ বারবার তুলে ধরেছে। উন্নত রাষ্ট্রের উন্নতির মূল সূত্রসমূহ কী, শিল্পোন্নয়ন কীভাবে সম্ভব, সমাজে নারী ও পুরুষের প্রকৃত দায়িত্ব ও অবস্থান কীরূপ– এই বিষয়গুলি বিশ্লেষণপূর্বক 'বেগম' বিভিন্ন দেশের উন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করেছে। যেমন– অগ্রগতির পথে তুরস্ক, শিল্পক্ষেত্রে জার্মান মহিলা, ব্রিটেনের সমৃদ্ধ সাধারণতন্ত্রের নারীসমাজ, প্রতিভাদীপ্ত জার্মান নারীসমাজ, ব্রিটেনে নারীর অর্থনৈতিক বৃত্তি, জাতিগঠনে নিয়োজিত আফ্রিকার নারীসমাজ, আজারবাইজানের উন্নত মহিলা সমাজ, অধিকার আদয়ের সংগ্রামে মালয়ের নারী, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে নারী, ব্রিটেনের চাকরিজীবী মহিলা, আলজেরিয়ার অগ্নিকন্যা জামিলা, ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামে বীর নারী, জীবনের সর্বস্তরে জার্মান নারী ইত্যাদি। আবার মুসলিম নারীজাতিকে উদ্দীপিত করার লক্ষ্যে দেশবিদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকল নারীদের জীবনালেখ্যও তুলে ধরা হয়েছে। যেমন– রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বিস্ময়কর প্রতিভা মার্গারেট মিচেল, ভেনি মার্কস, মহিয়সী নারীসকিনা, বিস্ময়কর শিল্প প্রতিভা গ্যান্তমা মোজেস, ইতিহাসের বীর নারী রিজিয়া, মহিয়সী নারী হেলেন কেলার, প্রতিভাময়ী কবি এমিলি ডিকিনসন, পুলিটজার পুরস্কার বিজয়ী কবি এডনা, ফ্রান্সের ফার্স্ট লেডি মাদাম দ্য গলে। এছাড়াও ১৫শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা থেকে 'জীবন

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামে জয়ী যারা' শিরোনামে একটি ধারাবাহিক নিয়মিত বিভাগ 'বেগম'–এ প্রকাশ করা হয়। সাক্ষাৎকারভিত্তিক এই নিবন্ধে লেখালেখি কিংবা সমাজকল্যাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনকারী বাঙ্গালি মহীয়সী ব্যক্তিত্বের জীবনালেক্ষ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে এতে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ, কবি মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, ড. নীলিমা ইব্রাহিম, জোবেদা খানম, আশালতা সেন, বেগম রোকাইয়া আনওয়ার প্রমুখ ব্যক্তিত্বের জীবনসংগ্রামের কাহিনী বিধৃত হয়েছে।

'বেগম'-এর প্রকাশিত রচনাসমূহের প্রকৃতি এবং চারিত্র্য বিশ্লেষণে বলা যায় বেগম অবশ্যই একটি যুগোপযোগী পত্রিকা। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে তৎকালীন পাকিস্তানে মেয়েদের বিচরণ কিংবা মেয়েদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা অনেক সীমিত ছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের জন্য সৌন্দর্যচর্চার কোনও কেন্দ্র, কিংবা ব্যায়ামাগার কিংবা রান্নাশিক্ষার কোর্স নিয়ে ভাবা ছিল রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার। এই দৃষ্টিভঙ্গি উপেক্ষা করে বরং প্রকৃত অবস্থা কী হওয়া উচিত তা তুলে ধরতে 'বেগম' মেয়েদের সামনে নিয়ে এল সৌন্দর্যচর্চা, স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা, রান্নার শৈল্পিক দিক। রূপচর্চা কেবল ত্যাজ্য নয়, একটা নির্লজ্জ মনোবৃত্তি বলেই মানুষের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু 'বেগম' মনে করেছে রূপচর্চা কেবল সংসারের সৌন্দর্য ও দাম্পত্য জীবনের গভীরতা বর্ধনের জন্যই নয়, উন্নত রুচির পরিচায়কও। বহু দুঃখ দুঃস্থতার মধ্যেও সৌন্দর্য মানুষের মনে কিছুটা শান্তি দেয়, জীবনে উৎসাহ ও উদ্যম ফিরিয়ে আনে। রূপচর্চার অর্থ যৌন আবেদন সৃষ্টি নয় কিংবা পুরুষের মন ভোলাবার জন্যও রূপচর্চা নয়– আসল সৌন্দর্যকে স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলাই এর কাজ।[১৩]

'বেগম' পত্রিকায় প্রতিষ্ঠাপর্বে এবং তার পরবর্তীকালে বেশ কিছু সময় অনেক গবেষণাসমৃদ্ধ, সুখপাঠ্য প্রবন্ধ, নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু '৫০-এর দশকের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ '৬০-এর দশকে নিরীক্ষাধর্মী লেখার চেয়ে সৃষ্টিশীল লেখা (গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক) প্রকাশিত হয়েছে বেশী। মূলত সময় যত অতিক্রান্ত হয়েছে মহিলাদের এই সৃষ্টিশীল ক্ষেত্রে অনুশীলনের প্রবণতা তত বেড়েছে। প্রবীণ লেখিকাদের রচনার পাশাপাশি বহু নতুন লেখিকার সাহিত্য প্রয়াস লক্ষ করা যায়। সে হিসেবে নারীদের মধ্যে সাহিত্যিক প্রচেষ্টা জাগ্রত করার যে লক্ষ্য 'বেগম' নির্ধারণ করেছে তা অনেকখানি সফল হয়েছে বলা যায়। তবে এ-প্রচেষ্টা নিরীক্ষাধর্মী লেখার ক্ষেত্রে সেভাবে অগ্রসর হয় নি। এ-প্রসঙ্গে 'বেগম'-এর ব্যাখ্যা–

> *প্রবন্ধ রচনায় আমাদের দৈন্য অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট। প্রামাণ্য ও গবেষণামূলক বিষয়বস্তু সম্বলিত পর্যাপ্ত প্রবন্ধ আমরা পাইনি।*[১৪]

উদ্দেশ্যের দিক থেকে 'বেগমে'র প্রধান দুটি উদ্দেশ্য ছিল– প্রথমত নারীসমাজকে সচেতন করে তোলা, দ্বিতীয়ত বাঙালি মুসলমান নারীদের সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে নিয়ে আসা। একারণেই 'বেগমে' শুধু লেখিকাদের লেখা প্রকাশিত হত। 'বেগম'ই ছিল একমাত্র পত্রিকা যার মাধ্যমে বাংলার মুসলমান নারীরা তাঁদের লেখা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিলেন। নিজেদের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখার পাশাপাশি নিজের একান্ত সমস্যা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা, শক্তির কথা দেখতে পেয়ে পত্রিকাটিকে মেয়েরা একান্ত নিজের করে ভাবতে পেরেছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'বেগমে'র চিঠিপত্র বিভাগে চোখ বুলালে। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইস্যুর পাশাপাশি একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়েও 'বেগম'

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদিকার কাছে পাঠিকারা চিঠি পাঠিয়েছে। পত্রিকাটিও পাঠকের চিঠির মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। পাঠকের পরামর্শ মাফিক নতুন বিভাগ খুলেছে। এ ক্ষেত্রে 'সেলাই বিভাগ'-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

বাংলার সৃজনশীল মহিলাদেরকে একটি বৃদ্ধিবৃত্তির সুযোগ করে দেবার জন্য 'বেগম' অবশ্যই বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার।[১৫] বিশেষত ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় এ-দেশের নারীসমাজের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার যে আগ্রহ ও গুরুত্ব বেড়েছিল তার বিকাশে 'বেগম' পত্রিকাই প্রধান সুযোগ এনে দেয়। এছাড়া নারীসমাজের বিভিন্ন খবর, নারী-আন্দোলনের নানা বিষয়ের উপর মতামত প্রকাশ করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা, মহিলা সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনার সুযোগ সৃষ্টি করা, গ্রাম-বাংলার মেয়েদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে 'বেগম'- এর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। একটি শিক্ষিত জাতি এরকম পত্রিকার জন্য গর্ববোধ করতে পারে।

তথ্যসংকেত

১. *মালেকা বেগম, নারী মুক্তি আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৮৬*

২. *মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত।*

৩. *সোনিয়া নিশাত আমিন, নারী ও সমাজ, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) তৃতীয় খণ্ড সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৭০৯*

৪. *মালেকা বেগম, প্রাগুক্ত।*

401827

৫. *প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সাপ্তাহিক বেগম।*

৬. *আফিকুন্নেসা করিম, মেয়েদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি, সাপ্তাহিক বেগম, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ২৩ অক্টোবর, ১৯৪৯, পৃ. ১৪*

৭. *কাজী শাহানআরা খাতুন, পাকিস্তানের নারীদের দায়িত্ব, সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৩রা আগস্ট, ১৯৪৭, পৃ. ৩*

৮. *মুসলিম সমাজ ও নারী, সাপ্তাহিক বেগম, ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯, পৃ. ৩*

৯. *বেগম নাজমা খাতুন, শিক্ষিতা মহিলাদের দরবারে, সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০ই আগস্ট, ১৯৪৭, পৃ. ১২*

১০. *সম্পাদকীয়, সাপ্তাহিক বেগম, ৫ম বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা, ৩রা আগস্ট, ১৯৫২, পৃ. ৩*

১১. *গার্হস্থ্য জীবনের সমস্যা, সাপ্তাহিক বেগম, ৭ম বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা, ১৮ই জুলাই, ১৯৫৪*

১২. *পাকিস্তানের বাণীচিত্র, সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৪৮, পৃ. ১৫*

১৩. *সাপ্তাহিক বেগম, প্রথম বর্ষ ৩১ সংখ্যা, ২১মার্চ, ১৯৪৮, পৃ. ৩*

১৪. *সাপ্তাহিক বেগম, ১৮শ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬৪*

১৫. *রেজিনা বেগম, বেগম পত্রিকা ও পূর্ব বাংলার নারীসমাজ (১৯৪৭-১৯৫৮), অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

নূরজাহান বেগমের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাক্ষাৎকার

নূরজাহান বেগম
সম্পাদক
সাপ্তাহিক 'বেগম'
ঢাকা, বাংলাদেশ

সংক্ষিপ্ত জীবনী : ১৯২৫ সালের ৪ জুন সাবেক ত্রিপুরা জেলার (বর্তমান চাঁদপুর) চালিতাতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন নূরজাহান বেগম। পিতা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন এবং মা ফাতেমা খাতুন। স্বামী রোকনুজ্জামান খান। শিক্ষাজীবন শুরু সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে। এই স্কুল থেকে ১৯৪২ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ থেকে ১৯৪৪ সালে ইন্টারমিডিয়েট এবং ১৯৪৬ সালে বি এ পাস করেন। ১৯৫২ সালে শিশুসংগঠক, শিশুসাহিত্যিক, সাংবাদিক রোকনুজ্জামান খানের (দাদাভাই) সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। নূরজাহান বেগমের কলেজ জীবন ছিল বর্ণাঢ্য। এখানে তিনি নৃত্য, নাটক, আবৃত্তিসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করেন।

১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের উদ্যোগে সাপ্তাহিক 'বেগম' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তখন পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল এবং নূরজাহান বেগম ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। ১৯৪৮ সালে তিনি 'বেগম'-এর সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৫০ সালে 'বেগম' কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তারিত হয়। কিন্তু ঢাকায় আসার পর 'বেগম'-এর জন্য সম্পাদককে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানের উর্দু ভাষার সমর্থক এবং মৌলবাদীদের কুসংস্কার মোকাবিলায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। মহিলাশিল্পীদের, লেখিকাদের সম্পর্কে তারা হীন মনোভাব পোষণ করতো। এই বাধাকে দূর করতে ১৯৫৪ সালে 'বেগম ক্লাব' গঠন করা হয়। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন শামসুন্নাহার মাহমুদ আর সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নূরজাহান বেগম। 'বেগম ক্লাব'–এ শিল্পী সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করা হতো, গুণীজনদের সংবর্ধনা দেয়া হতো। এভাবে একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরি করার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে লেখিকাদের জন্য সব বাধা অপসারণের চেষ্টা করা হয়। 'বেগম ক্লাব' নারীসমাজের উন্নয়নের জন্য ষাটের দশকের শেষপর্যন্ত ভূমিকা পালন করে।

নূরজাহান বেগমের কর্মকাণ্ড শুধু 'বেগম' পত্রিকা আর 'বেগম ক্লাব'কে ঘিরেই আবর্তিত নয়। তিনি ছাত্রী অবস্থায় থেকেই সমাজসেবামূলক কাজে ব্রতী হন। সম্পাদনার পাশাপাশি এসব কর্মকাণ্ডেও তিনি অতিশয় সক্রিয়, আন্তরিকতাপূর্ণ। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে লেডী

Dhaka University Institutional Repository

ব্রেবোর্ন কলেজে দাঙ্গাদুর্গতদের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়। নূরহাজান বেগম সেই ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে যেসব নারী দাঙ্গায় বিধবা হন, যেসব শিশু এতিম হয়, তাদের জন্য গঠন করা হয় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মুসলিম উইমেন্স অ্যান্ড অরফানেজ হোম'। নূরজাহান বেগম ১৯৫০ সাল পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ওই হোমের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬০ সাল থেকে নারিন্দা মহিলা সমিতির সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদের কার্যকরী সংসদ এবং জোন্টা আন্তর্জাতিক ক্লাবের সদস্য। নূরজাহান বেগম নিষ্ঠা ও কর্মপ্রয়াসের জন্য বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ মহিলা সমিতি, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, রোটারি ক্লাব, মহিলা সাংবাদিক ফোরাম, কাজী মাহবুব উল্লাহ-জেবুন্নেছা ট্রাস্ট, কমল মুশতারী পদক, সরোজিনী নাইডু স্মৃতি পরিষদ, বেগম রোকেয়া পদক, অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার এবং নারীপক্ষ সম্মাননা লাভ করেন।

সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন : বর্তমানে 'বেগম' পত্রিকার সার্কুলেশন কী রকম?

নূরজাহান বেগম : পনের হাজারের মত। এরা আমার নির্দিষ্ট পাঠক।

প্রশ্ন : 'বেগম'-এর পাঠক সংখ্যা কি কমছে না বাড়ছে? না একইরকম আছে?

নূরজাহান বেগম : একইরকম থাকা তো আসলে সম্ভব না আর বিজ্ঞাপনের দৃষ্টিভঙ্গি মাথায় রেখে আত্মপ্রচার না করলে সত্যি বলতে পাঠক সংখ্যা পূর্বের তুলনায় কিছুটা কমেছে।

প্রশ্ন : পাঠক ধরে রাখার জন্য আপনি কী করেন?

নূরজাহান বেগম : আমি মহিলাদের শিক্ষণীয় ও উপভোগ্য সব বিষয়ের সংবাদ দিতে চেষ্টা করি। তাছাড়া আমি আমার পাঠকের চিঠিপত্রের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেই। বলতে পারেন, তারাও সময়ে সময়ে চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমাকে অনেক কিছু শিখায়। তবে চটকদার, হালকা চটুল কিছু দেয়ার মধ্যে দিয়ে আমি পাঠক টানতে চাই না। আমার একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে, যে দায়বদ্ধতা থেকে 'বেগম' পত্রিকার আবির্ভাব, সেই একই দায়বদ্ধতা আমি আজো অনুভব করি। শুধু পাঠক ধরে রাখা কিংবা ব্যবসায়িক বৃদ্ধিই আমার লক্ষ্য নয়। আমার লক্ষ্য অবরুদ্ধা নারীদের সচেতন করা, শিক্ষা সম্পর্কে তাদের সচেতন করা, তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করা, নিজস্ব চিন্তা চেতনা প্রকাশ করার সুযোগ করে দেয়ায় মধ্য দিয়ে তাদের সাহসী করে তোলা, সর্বোপরি নতুন লেখিকাগোষ্ঠী তৈরি করা।

প্রশ্ন : চল্লিশের দশকের সামাজিক দায়বদ্ধতা আর আজকের সামাজিক দায়বদ্ধতা কী একই রকম?

নূরজাহান বেগম : অনেকাংশে একই রকম। ইতোমধ্যে সময় বয়ে গেছে অনেক। পরিস্থিতিরও উন্নতি হয়েছে– কিন্তু সার্বিক অবস্থার কি উন্নতি হয়েছে? নারীরা কি যা পাওয়ার কথা, তারা যা

Dhaka University Institutional Repository

পাওয়ার যোগ্য তা পেয়েছে? পুরুষ লেখক আর নারী লেখকদের অনুপাত কত? কত শতাংশ নারী শিক্ষিত, অধিকার-সচেতন? একথা নিশ্চিত, নারীর যা কিছু অগ্রগতি আমরা দেখতে পাচ্ছি তা শহরেই, গ্রামীণ নারী এখনো চল্লিশের দশকের অবস্থানেই রয়ে গেছে। আমার লক্ষ্যও এই পশ্চাৎপদ নারীসমাজ।

প্রশ্ন : অনেকে বলেন 'বেগম' পত্রিকার মান আগের মত নেই– তাদের এই ধারণা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?

নূরজাহান বেগম : তাদের অভিযোগ একদম উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিছুটা হয়তো ঠিক। তবে তার পেছনে যুক্তিও আছে। আমার পাঠক গ্রামেই বেশী। তাই গ্রামীণ জনগণ, বা যারা মাত্র শিক্ষিত হচ্ছে তাদের উপযোগী করেই আমি বিষয় উপস্থাপনের চেষ্টা করি। ভাষাগত ব্যাপারে আমি দাঁতভাঙা শব্দ, ভারী চালের বাক্য গঠন ও কঠিন প্রতিপাদ্য বিষয় উপস্থাপন করার পক্ষে নই। সহজভাবে আমার লেখকদের কথা পাঠক বুঝতে পারলেই আমি খুশি। এটাই অনেকের কাছে মান নেমে যাওয়া বলে মনে হতে পারে। তাছাড়া এখন প্রতিযোগিতার বাজার। বাজারে অনেক চটকদার পত্রিকা বেরিয়েছে। আমার পত্রিকার হয়তো সেভাবে এটা নেই। এছাড়াও রয়েছে আমার আর্থিক সীমাবদ্ধতা। আমার পত্রিকা বিজ্ঞাপন-নির্ভর নয়। আমার প্রেসের আয়েই পত্রিকা চলে। পাঠকের কথা ভেবেও পত্রিকা ছাপার ব্যয় আমাকে কম রাখতে হয়। ছাপার ব্যয় বেশি হলে পত্রিকার দামও বেড়ে যাবে যা ক্রয় করা আমার নির্ধারিত পাঠকদের জন্য কষ্টকর হবে।

প্রশ্ন : একসময় বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত সব লেখিকা আপনার পত্রিকায় লিখতেন। এখন তারা অনুপস্থিত।

নূরজাহান বেগম : এখন তাঁরা আগের মতো সময় দিতে পারেন না। সবাই ব্যস্ত। তাছাড়া তাঁরা এখন আর ক'জন ছোটগল্প লিখছেন বলুন। যাঁরা লিখছেন সবাই মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক। 'বেগম'-এর বিশেষ সংখ্যায় তাঁরা তো উপস্থিত থাকেন।

প্রশ্ন : বর্তমানের মহিলা সম্পাদিত এবং মহিলা বিষয়ক বেশ কয়েকটি পত্রিকা বেরোচ্ছে। সেগুলো সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?

নূরজাহান বেগম : মেকআপ গেটআপ বেশ ভালো। আমাদের চেয়ে অনেক ভাগ্যবান। তৈরী লেখকের এখন তো আর আগের মতো অভাব নেই। আপনি যদি প্রথম দিকের 'বেগম' দেখেন হাসবেন। এখন যারা প্রথমেই পত্রিকা বের করেন তারা লেখা ভালোই দিতে পারছেন। লেখালেখিতে অনেক শক্ত কলম এসে গেছে।

প্রশ্ন : একটি মহিলা পত্রিকা জনপ্রিয় করতে হলে একজন সম্পাদকের কোন বিষয়ে জোর দেয়া উচিত?

নূরজাহান বেগম : এটা খুব কঠিন প্রশ্ন। বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়েরও পরিবর্তন হয়। কাজেই নির্দিষ্ট করে যে কোনও একটি বিষয়ের কথা বলা সম্ভব নয়। বলা যায়ও না। তবু আমি বলব, সম্পাদকের প্রথম কাজই হবে পত্রিকাটিকে ভালবাসা। পত্রিকার পাঠককে ভালবাসা। মনে রাখতে হবে আমি একটা সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছি। কাজেই

Dhaka University Institutional Repository

পাঠককে গুরুত্ব দিতে হবে। সম্পাদকের দায়িত্ব পাঠককে শুধু তথ্য জানানো বা বিনোদন দেয়াই নয় বরং এর মধ্যে দিয়েই পাঠককে শিক্ষিত করা, সচেতন করা, পাঠকের রুচিবোধ উন্নত করা। পাঠককে নিয়ে ভাবতে গিয়ে ভাবতে হবে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা। পাঠক শুধু শহরের নয়, গ্রামের মেয়েরাও। দুর্বোধ্য ও অপ্রিয় কিছু তাদের ওপর চাপানো উচিত হবে না। মনে রাখবেন আমাদের দেশে প্রথমে গ্রাম, সেখান থেকে শহর। তাছাড়া আমি আগেই যা উল্লেখ করেছি, পাঠকের সঠিক মতামতকে মূল্য দিতে হবে গভীরভাবে।

প্রশ্ন : সার্বিকভাবে বেগমের সফলতা সম্পর্কে বলুন।

নূরজাহান বেগম : 'বেগম'-এর প্রথম সফলতাই হচ্ছে এটি বাঙালি মুসলিম নারীদের প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং প্রথম বাঙালি মুসলিম-মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা। যে সামাজিক পরিস্থিতিতে 'বেগম'-এর আর্বিভাব সেই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে 'বেগম'-এর অবদান সচেতন নাগরিক মাত্রই জানা। 'বেগম'-এর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে নতুন লেখক সৃষ্টির প্রয়াস।

শুধু লেখালেখির অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য 'বেগম' তার পাতাকে অনুশীলনী ক্ষেত্র হিসাবে ছেড়ে দিয়েছে পাঠকের হাতে। 'বেগম' ছিল নতুন লেখিকাদের মত প্রকাশ করার স্থান। আমরা যে কত অপাঠ্য লেখা পেয়েছি, কিন্তু কোনও লেখাই নিতান্ত বাধ্য না হলে আমরা ফেলিনি বরং তার উপর কলম চালিয়েছি, ছাপার উপযোগী করেছি। অনেক সময় এরকমও হয়েছে যে ছাপার উপযোগী করে গড়ে তোলার পর যে লেখা দাঁড়িয়েছে মূল লেখার সঙ্গে তার ফারাক আকাশ পাতাল। কিন্তু তবুও সেই লেখা আমরা সেই লেখিকার নামেই ছেপেছি যেন সে উৎসাহ না হারায়। আমরা মনে করতাম এভাবে চেষ্টা করতে করতে এক সময় সে ভালো লেখিকা হবে। আজকের দিনের অনেক বিশিষ্ট লেখিকাই প্রথম লিখেছেন 'বেগম' পত্রিকায়। যেমনঃ সেলিনা পন্নি, রাবেয়া খাতুন, অন্নপূর্ণা গোস্বামী, হুসনা বানু খানম, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ, জুবাইদা গুলশান আরা, মন্‌জুলিকা দাশগুপ্তা প্রমুখ।

আর একটি বড় বিষয় যেটা আমি মনে করি, সেই ১৯৪৭ সাল থেকে আজ অবধি 'বেগম' প্রকাশিত হয়ে আসছে একই মালিকানায়, একই প্রতিষ্ঠান থেকে এবং কোনও দীর্ঘ বিরতি ছাড়া। আমার জানা মতে আমাদের দেশে এত দীর্ঘমেয়াদি প্রকাশ আর কোনও পত্রিকার নেই। এটাও 'বেগম'-এর জন্য একটা বড় সফলতা।

প্রশ্ন : আপনাকে ধন্যবাদ।

নূরজাহান বেগম : আপনাকেও ধন্যবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক-গ্রন্থ

অদিতি ফাল্গুনি, *বাংলার নারী: সংগ্রামী ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে*, ঢাকা, স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ২০০১।

অধ্যাপক মজির উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা*, ঢাকা, ১৯৬৭।

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র (১৮৩১-১৯৩০)*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯।

আবদুল কাদির সম্পাদিত, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, ঢাকা, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৬।

আবুল কালাম (সম্পাদিত), *সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া*, উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২।

আবদুল্লাহ আল মূতী ও আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা*, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৮৯।

ইয়াসমিন আহমেদ, *গবেষণা পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান পরিচিতি*, অলিভিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, জুন ১৯৯৮।

কনক মুখোপাধ্যায়, *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা*, কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৯৩।

কাজী আবদুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৬৩।

গোলাম মুরশিদ, *সংকোচের বিহ্বলতা: আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ-রমণীর প্রতিক্রিয়া (১৮৪৯-১৯০৫)*, ঢাকা; বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

জামিল চৌধুরী, *বানান ও উচ্চারণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

তপন বাগচী, *তৃণমূল সাংবাদিকতার উন্মেষ ও বিকাশ*, এমএমসি, ঢাকা, ১৯৯৯।

তাহ্‌মিনা আলম, *বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ*, কলকাতা, ১৯৭৭।

বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সংকট*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০।

বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ, আনন্দবাজার পত্রিকাব্যবহার বিধি, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৬।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৩৫৭।

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫)*, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২, ১৯৬৩।

মালেকা বেগম, *নারীমুক্তি আন্দোলন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

মালেকা বেগম ও সৈয়দ আজিজুল হক, *আমি নারী– তিনশ বছরের (১৮-২০শতক) বাঙালি নারীর ইতিহাস*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০১।

মাহবুবুল হক, *বাংলা বানানের নিয়ম*, ঢাকা, ১৯৯৫।

মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র (১৮৪৭-১৯০৬)*, ঢাকা, ১৯৯৩।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত ১৯০১-১৯৩০*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭।

মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *নারী*, ঢাকা, ১৯৯৭।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *মুসলিম সম্পাদিত বাংলার সাময়িকপত্রে ধর্ম ও সমাজচিন্তা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৫।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (সম্পাদিত), *সাময়িকপত্রে সাহিত্যিক প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *সাময়িকপত্রে সাহিত্যচিন্তা: সওগাত*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮১।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ*, সওগাত প্রেস, ঢাকা, ১৯৮৫।

যোগেশচন্দ্র বাগল, *জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৫৪।

নরহরি কবিরাজ, *উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ: তর্ক ও বিতর্ক*, কলকাতা, ১৯৮৪।

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম নিয়োগী, *ভারত ইতিহাসে নারী*, কলকাতা, ১৯৮৯।

লায়লা জামান, *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯।

দিলওয়ার হোসেন, *মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

সুব্রত শঙ্কর ধর, *বাংলাদেশের সংবাদপত্র*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

সুরভী বন্দ্যোপাধ্যায়, *গবেষণা প্রকরণ ও পদ্ধতি*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯০।

সুশোভন সরকার, *বাংলার রেনেসাঁস*, কলিকাতা, ১৯৮১।

সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস: (সমাজিক-সাংস্কৃতিক)*, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০।

হায়াৎ মামুদ, *বাংলার লেখার নিয়ম-কানুন, বানান ও ভাষারীতির গাইডবুক*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৬।

S. Natarajan, *A History of the Press in India*, Bombay, Asia Publishing House, 1962.

S.M.A. Feroze, *Press in Pakistan*, Lahore, National Publishing, 1957.

Dhaka University Institutional Repository

David Deacon et al. *Researching Communication: A Practical Guide to Methods in Media and Cultural Analysis*, London, Arnold Publications, 1999.

F. Gerald Kline and Philip J. Tichenor, *Current Prescrives in Mass Communication Research*, London, Sage Publication, 1972.

J.E. Gerald, *The Social Responsibilities of the Press, Minnepolis*, Unoin of Minnosota Press, 1964.

Lewis Anthony Dexter, *Elite and Specialized Interviewing*, Evaston, Northwestern, 1970.

Molly Graham. *Journalism for Women*, London, 1949.

Paul M. Hirsch and Others (edt.), *Strategies for Communication Research,* London, Lewis Donolew. Content Analysis of Communications. New York, Sage Publication, 1977.

Richard W. Budd, Robert K. Thorp and Lewis Donohew, *Content Analysis of Communications*, New York, McMillan, 1967.

Ralph E. Dyar. *Newspaper Promotion and Research*, New York, Harper, 1942.

Ralph O. Nafziger and M.M. Wilkerson (edt), *An Introduction to Journalism Research*, New York. Greenwood Press, 1942.

Sonia Nisat Amin, *The World of Muslim Women in Colonial Bengal (1876-1939)*, New York, 1996.